কাব্যে প্রকৃতি ঃ
প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্য
(বেদ, উপনিষদ, সংস্কৃত, প্রাচীন ও মধ্যযুগ, আধুনিক বাংলা কাব্যে প্রকৃতির রূপ)

কাব্যে প্রকৃতি : প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্য

(বেদ উপনিষদ, সংস্কৃত, প্রাচীন ও মধ্যযুগ, আধুনিক বাংলা কাব্যে প্রকৃতির রূপ)

ঋগ্বেদ হইতেই ভারতীয় প্রকৃতি চেতনার মূল অনুসন্ধান করা চলে। ঋগ্বেদে ইন্দ্র, সূর্য, বরুণাদি দেবতা যেমন বন্দিত হইয়াছেন, তেমনি নদী, জল ইত্যাদিও প্রসঙ্গসূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। জগতীছন্দে সিন্ধুক্ষিৎ ঋষি নদী দেবতার বর্ণনা প্রসঙ্গে সিন্ধুনদীর এক চমৎকার বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। সিন্ধুক্ষিৎ ঋষি বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

> স্বশ্বা সিন্ধুঃ সুরথা সুবামা হিরণ্যয়ী সুকৃতো বজিনবতী।
> ঊর্নাবতী যুবতিঃ সীলমাবত্যুতাধি বস্তে সুভগা মধুবৃধ্ম।।
> সুখং রথং যুযুজে সিন্ধুরশ্বিনং তেন বাজং সনিষদস্মিন্নাজৌ।
> মহান্ হাস্য মহিমা পনস্যতেহদব্ধস্য স্বযশসো বিরপ্শিনঃ।। [১]

—'সিন্ধু চিরযৌবনা ও সুন্দরী, এঁর উৎকৃষ্ট ঘোটক, উৎকৃষ্ট রথ এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র আছে, সুবর্ণের অলঙ্কার আছে, এঁর তীরে সীলমা খড় আছে। ইনি মধু প্রসবকারী পুষ্পের দ্বারা আচ্ছাদিত। সিন্ধু ঘোটকযুক্ত অতি সুখকর রথ যোজনা করেছিলেন, তা দ্বারা এ যজ্ঞে অন্ন এনে দিয়েছেন। এর মহিমা অতি মহৎ বলে স্তব করে। ইনি দুর্ধর্ষ, আপনার যশে যশস্বী এবং মহৎ।'

নদী বর্ণনা ঋগ্বেদে প্রাণবন্ত। বেদের অন্যান্য দেবতাদের মত সূর্য বন্দনাও চমৎকার। সবিতা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে — সবিতা চলিয়াছেন নীল আকাশপথে, তিনি নিজে আবর্তন করিতে করিতে সারা ভুবন দেখিতে চলিয়াছেন। সোনার রথে তিনি চলিয়াছেন। তিনিই আলো ও অন্ধকারের নিয়ন্তা।

---

(১) ঋগ্বেদ সংহিতা, দ্বিতীয় খণ্ড। রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত। হরফ প্রকাশনীসূক্ত ৭৫। পৃ: ৪৪৪

'পুরুরবা ও উর্বশী' দেবতার বর্ণনা ত্রিষ্টুপ ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনা মূলত: ভারতীয় রমণীর আদিমতম লিখিত রূপ। পুরুরবা সূর্যের অন্যনাম। উর্বশীর আদি অর্থ ঊষা। পুরুরবা পত্নী উর্বশীকে বলিতেছেন : হে পত্নী। তোমার চিত্ত কি নিষ্ঠুর। অতি শীঘ্র চলিয়া যাইও না, আমাদের উভয়ের কিঞ্চিৎ বাক্যালাপের আবশ্যক। এখন যদি মনের কথা বলিতে না পারি ভবিষ্যৎ সুখের হইবেনা।

উর্বশীর উত্তর : তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়া আমার কি হইবে? আমি প্রথম ঊষার ন্যায় চলিয়া আসিয়াছি। হে পুরুরবা আপন গৃহে ফিরিয়া যাও। বায়ুকে যেমন ধারণ করা যায়না, তুমিও তেমনি আমাকে ধারণ করিতে পারিবে না।—এই কথোপকথনমূলক ধ্রুপদী বাক্প্রতিমা বা চিত্রকল্পের দিক থেকে অনবদ্য।

বশিষ্ঠের উক্তি —

'তিনি আমাদের আলোকিত করেন যুবতী স্ত্রীর মতন, প্রতিটি প্রাণীকে শয্যাগ্রণ করাইয়া কাজে পাঠান। মানুষকে আপন জ্বালাইতে হয়। (প্রত্যুতকালীন প্রার্থনার জন্য) তিনি অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া আলোকমালা লইয়া আসেন।'

'তিনি সর্বত্র প্রসারিত ও চরাচর ব্যাপ্ত হইয়া ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হন, এবং সকলের কাছে আগাইয়া আসেন। অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া তিনি দীপ্যমান হন। তিনি প্রত্যুতকালীন মেঘমালার জননী, তিনি দিনও নেত্রী, সোনালী রঙের কিরণমালায় ভূষিতা ঊষার দর্শন পরম রমণীয়।'

'হে শক্তিময়ী উষা, তুমি যেখানেই যাব, সেইখানেই তুমি মূর্তিমতী আশীর্বাদ, প্রতিকূলতা অপসারিত কর, চারণভূমিগুলিকে বিস্তীর্ণ কর, আমাদের নিরাপত্তা বিধান কর। ঘৃণিতদের দূর কর, বিত্ত ঐশ্বর্য প্রদান কর। পূজারীর সাথে তুলে ধর সম্পদ।'

'হে উজ্জ্বল উষা, আমাদের জন্য তোমার শ্রেষ্ঠ রশ্মিমালার কিরণদান কর, তুমি আমাদের সুদীর্ঘজীবী কর, তুমি সকলের প্রীতি, তুমি আমাদের খাদ্য দান কর, বেন, অশ্ব এবং রথের মাধ্যমে সম্পদ দান কর।'

'হে সপ্ত সপ্তা-তরংগীয়, আকাশ দুহিতা উষা, বলিষ্ঠরা যাহাকে সখীতের মাধ্যমে অধিকতর মহনীয় করিয়া তুলে, (তুমি) আমাদের বিত্ত সম্পদ দান কর, তোমার আশীর্বাদ দ্বারা সর্বদা আমাদের রক্ষা কর।' (১)

আলোচ্য সূক্তগুলি একটি নিছক কবিতা – কিন্তু বেদের মৌলিক কবিতার একটি অপূর্ব নিদর্শন। এই স্তোত্রগুলিতে কোন কষ্টকল্পিত চিন্তা নাই, কোন উৎকৃষ্ট চিত্রকল্পও নাই। ইহা হইল সদ্যস্নাতার মত উষার আবির্ভাবে বিস্ময়াভূত মানবমনের অনুভূতির সহজ বাঙ্ময় প্রকাশ। এই স্তোত্রগুলির মধ্যে সেই কারণেই কোন অচেতন প্রয়াস নাই। কিন্তু প্রকাশের আশ্চর্যদ্যুতিতে আদিম ভারত সমাজের মানবমন বিচ্ছুরিত একটি মহান চিত্রকল্পের অবতার না। এই সমস্ত স্তোত্র শব্দ সম্পদে সরল এবং প্রাণোল্লাসে সঞ্জীবিত। এখানে ব্যক্তিমানসের জটিল প্রতিক্রিয়ার গূঢ় কোন অনুসন্ধিৎসা নাই, আছে সমগ্র মানবসমাজের প্রতিভূরূপী আদিম ভারতের কোন এক বশিষ্ঠের মধ্যে ভারতের বিশিষ্ট

---

(১) ঋগ্বেদ, সূক্তের অনুবাদ (৭, ৭৭)

কাব্যিক সৌন্দর্যের প্রাকৃতিক বস্তুর বিশিষ্টরূপ। যদিও রূপবর্ণনায়, কাব্যিক সৌন্দর্যে প্রকাশের দ্যোতনায় নিসর্গ সৌন্দর্য অপূর্ব চিত্রধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। ইহা শুধুমাত্র কোন ধর্মানুষ্ঠানের হোতা বা কোন আশ্রমিক ঋষির দ্বারা বন্দিত হওয়া সম্ভব নয় — তিনি মূলতঃই কবিপ্রাণ। সৃষ্টির আদিম রহস্যের প্রকৃতির অঙ্গ নির্যাসিত বিবিধ বর্ণাঢ্য রূপগুলি তাহারই মধ্য দিয়া বাঙ্ময় হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা শুধু বর্ণনা নয় — কাব্যময়ও। তাই এই ঋষিরা কবিও ছিলেন। সুতরাং এই ঋগগুলির মধ্য হইতে প্রাচীন ভারতের কবিপ্রকৃতির ও প্রকৃতির প্রতি কবিদের অনুভব, ভাবনা এবং তাহাকে গ্রহণ করিবার ক্ষমতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর এই সব ঋগের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। তাহা না হইলে উমাকে কখনও (Radiant mover of Sweet sounds) বলিয়া কল্পনা করা যাইতনা। উমা প্রাচীন যুগে আলো দিয়াছেন, সে আলো দিয়া চলিয়াছেন, কতকাল যে দিবেন তাহা কেহ বলিতে পারেনা। তিনি প্রত্যহ যুবতী নারীর মধুর কণ্ঠস্বর লইয়া — সেইদিনের ঋষিদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন। মানব প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী তাহার (উমার) বার্ধক্য আজিও আসে নাই, আজিও তিনি অনুরূপ দীপ্যমান তাহার আগমনে পাখীরা তাহাদের নীড় ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে। খাদ্যের অন্বেষণে, মানুষও সেই পাখীর কাকলিতে আপন খাদ্যান্বেষী চিন্তায় চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তোলে। পদযুগরূপ খাদ্যের সন্ধানেই উমার দ্বারা সিক্ত শিশিরকে মাড়াইয়া আজও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই উমা আজিও তাঁহার কল্যাণময়ী মূর্তিমতী আশীর্বাদীরূপ দিয়া দুরাত্মা এবং ঘৃণ্য অন্ধকারকে নিবারিত করিয়া প্রকৃতিকে আলোর আশীর্বাদপুষ্ট করিতেছেন। এই অবিনশ্বর উমার রূপ

আদিম ভারতে যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল তিনি নিশ্চয় কোন আশ্রমবাসী ঋষিমাত্র ছিলেন না — তিনি ছিলেন কবি। এই কাব্যধারার মধ্যে যদিও ব্যক্তিমানসের পুঙ্খানুপুঙ্খ সচেতন বিস্তারিত অনুভূতি সঞ্চারীমূর্তি ছিলনা অথবা কখনই মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে এক নিবিড় বন্ধন স্থাপন করিবার প্রয়াস ইহাতে ছিলনা। কিন্তু তাহা হইলেও প্রকৃতির বিভিন্ন কার্যধারার মধ্যে একটি মূল উপাদানের রহস্য তাঁহারা আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন — যেখানে কাব্যচিন্তা ছাড়াইয়া গিয়া দর্শন চিন্তা লাভ করিয়াছে। তাঁহারাই প্রকৃতির এই সমস্ত রহস্যময় উপাদানের মধ্যে একতাবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার ঐকান্তিক আগ্রহ লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহারা আরও লক্ষ্য করিয়াছেন যজ্ঞের মধ্যে যেমন অগ্নির স্পর্শে নানা বিরুদ্ধ উপাদান এক হইয়া যায় তেমনি এই বিশ্বচরাচরের মূলে প্রকৃতির বহুবিধরূপ, শক্তি ক্ষমতা ও প্রকাশের মূলে একই শক্তির প্রভাবে — এই সক্রিয় ইচ্ছাসাধনে একাকার হইয়া যায়। এই কথা যিনি উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনিই উপলব্ধি করেন, এই বিশ্বচরাচরের মূলে এই শক্তি এবং একই ইচ্ছা সক্রিয়। ভারতের অদ্বয়বাদের প্রকাশের আবাহমান ধারা শুধু বেদের ঋক্‌গুলির মধ্যেই নিহিত নয় — ইহা গঙ্গা ধারার মতই ভারতের মানসলোককে নিষিক্ত করিয়া আবাহমান কাল গঙ্গা যেমন প্রকৃতির অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে — উহাও তেমনি মানস প্রকৃতির ধারায় তখনও অভিন্ন রহিয়াছে।

প্রকৃতির মধ্যে জীবত্ব আরোপ ঋগ্বেদের নিসর্গ প্রীতির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। (১) 'ঋগবেদের বিভিন্ন সূক্তে যে ভাবে ঊষার বর্ণনা করা হয়েছে, আধুনিক যুগে কোন কবিও হয়ত অনুরূপভাবে ঊষার বন্দনা করতেন। ঊষা মানুষের পরম সুহৃদ,

(১) বৈদিক সাহিত্যে প্রকৃতি। কমল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রথম মুদ্রণ। পৃ: ৪৮৬

তিনি যুবতী স্ত্রীর মত মৃদুহাস্যময়ী, তিনি আকাশ দুহিতা, তিনি মানুষের রাজপথের কথা চিন্তা করেন (১, ১২৩, ১), তিনি অশ্বদাত্রিনী (১, ৪৮, ১), তিনি নিরন্তর সেই এক শাশ্বতদেবী (১, ১২৪, ৪, ১, ১২৩, ৮), তিনিই মানুষকে বার্ধক্যের পথে চালিত করেন (১, ১২, ১১), কিন্তু তিনি স্বয়ং যুবতী বার্ধক্য কদাপি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না''(১, ১১৩, ১৫)। উষাকেই কন্যা ও যুবতীরূপে কল্পনা করিয়া উষাকে বলা হইয়াছে—'দেবী। কন্যার ন্যায় শরীরাম্বর বিকাশ করিয়া তুমি দানশীল ও দীপ্তিমান (সূর্যের) নিকট গমন কর। পরে যুবতীর ন্যায় অত্যন্ত দীপ্তিবিশিষ্টা হইয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ তাহার সম্মুখে বক্ষোদেশ অনাবৃত কর। (১) আবার প্রকৃতিতে জীবন্ত আরোপ করিবার নিদর্শন'হে দীপ্তিমান সর্বপ্রকাশক সূর্য। হরিৎবর্ণক অশ্বরথে তোমাকে বহন করে, জ্যোতিই তোমার কেশ।'

'অগ্নি মহৎ, পরিত্রাণরহিত, ধূমকেতু বিশিষ্ট ও বহুদীপ্তিসম্পন্ন।'

'হেমন্তগণ, তোমাদিগের যে অশ্বগণ (রথ) নিত্য বলে সমস্ত লোক ভ্রমণ করে, তাহারা নিজেই রথে যুক্ত হইয়া গমন করে। তোমাদের গমন অতীব আশ্চর্য। লোকে আয়ুধ উত্তোলিত করিলে যেরূপ ভীত হয়, সমস্ত ভুবন ও অট্টালিকা তোমাদের গমন কালে সেইরূপ ভীত হয়।' (১)

'রশ্মিগণ তাঁহাদিগের (দ্যাবাপৃথিবী) পরিচ্ছদ করিতেছে। সুব্যাপারনিরত রশ্মিগণ অন্তরীক্ষের মধ্যে নতুন তন্তু বিস্তার করিতেছে। এই রকম সূর্য, উষা,

---

(১) ঋগ্বেদ সংহিতা (অনুবাদ) রমেশচন্দ্র দত্ত। বাংলাকাব্যে প্রকৃতির রূপ ১ম সংস্করণ। অমিয় কুমার সেন। পৃঃ ২৬

ঋতুৎপণ, দাব্যা পৃথিবী ও বায়ুকে এবং প্রকৃতির দৃশ্য ও নৈসর্গিক প্রপঞ্চগুলিকে প্রাণবান শক্তিশালী মানব মানবীরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে।'(১) 'পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদ যাহার রচনাকাল খৃঃপূর্ব ১৫০০ হইতে ৯০০ পর্যন্ত এবং যাহার সূক্ত ১১২৮ তাহা ছিল বিভিন্নকালের বিভিন্ন কবির রচনা। তাই একই গ্রন্থে বহুতর বিভিন্ন আদর্শ রচনার দক্ষতা এবং রচনাশৈলীর বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা লক্ষণীয়। যদিও এইগুলি বিধিবদ্ধ ছন্দ রীতি ও পরিণত সাহিত্যনীতিকে অবলম্বন করিয়া করা হইয়াছে।'(২) A.L.Bacham এর মতে ঋগ্বেদ একটি অতি উচ্চ সাহিত্যিক নিদর্শন। নিসর্গ বর্ণনায় সেই সাহিত্য এবং তাহার কাব্যাংশ হিসাবেও কবিত্বরসে ভাষার প্রয়োগে এবং রূপক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেইগুলিকে ভারতীয় সাহিত্যের অগ্রদূত হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

কয়েকটি সূক্তে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় প্রীতির পরিচয় ইহার অনেক জায়গাতেই ছড়াইয়া আছে। রাত্রির প্রতি রচিত রাত্রির একটি বর্ণনা, 'রাত্রি দেবী আগমন পূর্বক চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি নক্ষত্রসমূহের দ্বারা অশেষ প্রকার শোভা সম্পাদন করিয়াছেন।'

'রাত্রিদেবী আসিয়া উষাকে আপন ভগিনীর ন্যায় পরিগ্রহ করিলেন, তিনি অন্ধকার দূরীভূত করিলেন।'

'গ্রাম সমূহে নিস্তব্ধ হইয়াছে, পদচারীরা, পক্ষীরা, শীঘ্রগামী শ্যেনগণ, সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া শয়ন করিয়াছে।' (৩)

---

(১) ঋগ্বেদ সংহিতা (অনুবাদ) রমেশচন্দ্র দত্ত। বাংলাকাব্যে প্রকৃতির রূপ ১ম সংস্করণ। অমিয় কুমার সেন। পৃঃ ২৪

(২) ,, ,, ,,

(৩) ঋগ্বেদ সংহিতা (অনুবাদ) রমেশচন্দ্র দত্ত। আধুনিক বাংলাকাব্যে প্রকৃতিররূপ। অমিয় সেন। ১ম সংস্করণ। পৃঃ ১০

'কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার স্পষ্ট নয় হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহার নিকট পর্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে। হে ঊষাদেবী, আধার রূপকে যেমন পরিশেষ পূর্বক নষ্ট কর, তদ্রূপ অন্ধকারকে নষ্ট কর।'

'হে আকাশের কন্যারাত্রি, তুমি যাইতেছ, তোমাকে পাত্রীর ন্যায় এই সমস্ত স্তব অর্পন করিলাম। তুমি গ্রহণ কর।' ①

এই সূত্রগুলি যেমন রাত্রির মধ্যে মনকে নিমগ্ন করে, চৈতন্যকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন মগ্ন করে, তেমনি আর একটি বর্ণনায় অরণ্যানী স্তবগানে নিসর্গ চিত্রের বিচিত্র বর্ণনায় অর্থের মধ্যে ঝঙ্কারে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়ে, প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রীতির পরিচয় কবিতাগুলির স্তরে স্তরে প্রস্ফুটিত। প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রীতির পরিচয়ে ইহারা হইল উত্তম নিদর্শন। অরণ্যকে স্তব করিতে যাইয়া বলা হইয়াছে —(১) হে অরণ্যানী তুমি যেন দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইয়া যাও। তুমি গ্রামে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করনা? তোমার কি একাকীত্ব থাকিতে ভয় হয়না?''

'এক শব্দ বৃষের ন্যায় শব্দ করিতেছে, আর এক শব্দ চী চী ইত্যাকার শব্দ করিয়া যেন তাহার উত্তর দিতেছে, যেন ইহারা বীণার ঘটায় ঘটায় শব্দ নির্গত করিয়া অরণ্যানীকে বর্ণনা করিতেছে।'

'তবে কি সেই এক ব্যক্তি পাত্রীকে প্রেরণ করিতেছে? তবে কি এই আর এক ব্যক্তি রশ্মি ছেদন করিতেছে? অরণ্যানীর মধ্যে যে ব্যক্তি থাকে, সে জানে যেন সন্ধ্যাবেলাকে চিৎকার করিয়া উঠিল।'

---

(১) ঋগ্বেদ সংহিতা - (অনুবাদ) রমেশ চন্দ্র দত্ত। বাংলাকাব্যে প্রকৃতির রূপ। অমিয় কুমার সেন। প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৩৩-৩৬

'বাস্তবিক অরণ্যানী কাহারও প্রাণ বধ করেনা। অন্য অন্য পশু না আসিলে তথায় কোন আশঙ্কা নাই, তথায় সুস্বাদু ফল আহার করিয়া অতি সুখে কালক্ষেপ হয়।'

'ঘৃণনাভির ন্যায় অরণ্যানীর সৌরভ কত, আহার তথায় বিদ্যমান আছে, তথায় বৃদ্ধলোক আদৌ নাই। অরণ্যানী, হরিণদিগের জননী স্বরূপা। এইরূপে আমি অরণ্যানীর বর্ণনা করিলাম।'(১) প্রকৃতির এই বর্ণনায় যে আনন্দের অনাবিল ধারা রহিয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। উপনিষদের ঋষিদের দার্শনিক চিন্তা এই কথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে জগতের জড় উদ্ভিদ ও চেতনের মধ্যে একটি বিশ্বপ্রাণ নিরন্তর স্পন্দিত হইতেছে।

''যদিদং কিঞ্চিত জগৎ সর্বং প্রাণ এ জাতি নিঃসৃতম্।'' (২)

পরমলীলা হইতে নিঃসৃত হইয়া ইহারা সমস্ত প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হইতেছে। ঋতুতে ঔষধিতে বনস্পতিতে যে বৈচিত্র্যপরম প্রাণের লীলা হইতে নিঃসৃত হইয়া কম্পিত হইতেছে সেই বিচিত্রের পদপ্রান্তে পৌঁছাইয়াছে।

যৌ দেবোঽগ্নৌ যো হপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যৌ বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।। (৩)

এই যে জড় ও চেতনের সঙ্গে ভারতীয় মনের আত্মীয়তা ইহা উপনিষদেরই উত্তরাধিকার। পরবর্তী কালের সমস্ত কাব্যেই এই উত্তরাধিকার বহন করিয়াছে।

।। রামায়ণ ও মহাভারত ।।

রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে, বেশি রামায়ণের মধ্যেই প্রকৃতির বর্ণনার প্রাধান্য

(১) বাংলা কাব্যে প্রকৃতির রূপ। অমিয় কুমার সেন। প্রথমমুদ্রণ। পৃ ৩১-৩২।
(২) উপনিষদ — অতুলচন্দ্র সেন। ২।৩।২, পৃ: ৮৫। দ্বিতীয় সংস্করণ।
(৩) শ্বেতাশ্বেতকেপনিষদ্ ২।১৭, অতুলচন্দ্র সেন। দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ: ৩১৭

দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণে সীতার মনের গভীর ভাবাবেগ ও আশঙ্কাজ প্রকৃতির বিবিধ উপাদানের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া ** ব্যঞ্জনাময় হইয়া উঠিয়াছে। পক্ষী সমূহে পরিব্যাপ্ত পাদপ সকল ঊর্ধ্বগামী বায়ুদ্বারা সমাবৃত ও কম্পিতাগ্র হইয়া যেন তাহাকে ভয় করিবেন না ইহা বলিতে লাগিল। পদ্মসকল বিধ্বস্ত এবং মীন প্রভৃতি জলচারী জন্তু সমূহ ত্রস্ত হওয়ায়, পদ্মাকর সরোবর সকল উৎপলবিহীনা সখীর ন্যায় যেন মিথিলারাজ দুহিতা সীতার নিমিত্ত শোক করিতে লাগিল।[১] পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, জলচরী জন্তুসমূহ, পদ্মাকর সরোবর, পর্বতের শৃঙ্গ, নির্ঝর, শ্রীমান সূর্য সকলেই সীতার শোকে কাতর হইয়া উঠিয়াছিল। আবার রামায়ণের ঋতুগুলি বর্ষা, শরৎ, বসন্ত, কোথাও কোথাও প্রকৃতিতে মানব মনের আরোপ সন্ধানের একমাত্র প্রয়াসের বাহিরে ভাবানুযায়ী প্রকৃতিচিত্র চিত্রনের কাব্যিক প্রয়াস বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। রামায়ণের প্রকৃতি বর্ণনায় রূপকের সমুখ প্রয়োগ দেখা যায়। পরবর্তীকালে কালিদাস এই রূপকের সচেতন প্রয়োগে মিথহস্ত, সরস সজীব এবং সুখেতে মনচিত্তরঞ্জনীয় হইয়াছিলেন। নিসর্গে মানবত্ব প্রয়াসের দিনগুলি কাটাইয়া কাব্যের জগতে প্রকৃতি চিত্র বর্ণনায় রূপকের প্রয়োগ নিঃসন্দেহে একটি কালের উত্তরণ। কারণ রীতি হিসাবে নিসর্গে মানবত্ব আরোপের প্রয়াস প্রকৃতিচিত্র চিত্রনে, রূপকের প্রয়োগ সম্পূর্ণ বিপরীত রীতি। উদ্দেশ্যবিহীন প্রকৃতি বর্ণনা অর্থাৎ Nature for nature sake কাব্যের জগত অনেক পরবর্তীকালে আসিয়াছে তাই

---

(১) অনুবাদটি বর্ধমান মহারাজের ব্যয়ে মুদ্রিত মূল রামায়ণের অনুবাদ গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

রামায়ণে তাহার প্রকাশ থাকা সম্ভব ছিলনা। রামায়ণে বিবিধ প্রকৃতি বর্ণনায় একই দৃশ্য সম্ভার – একঘেয়ে পুনরুক্তির দ্বারা বিধৃত। কিন্তু ভারতীয় মানসিকতায় সেই পুনরুক্তিকে কখনই অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় নাই। পাঠকের নিকট কখন ক্লান্তিকর বোধ হয় নাই। প্রকৃতি বর্ণনার কাব্যিক দ্যুতিতে রামায়ণের পাঠকমনকে চকিতে ধাঁধাইয়া দেয়, ''মহাসাগর যেন তরঙ্গ সকলের অগ্রভাব দ্বারা ফেনরূপ চন্দন পেষণ করিতেছিলেন এবং শশধর নিজ কর সমূহের দ্বারা তাহা গ্রহণ করতঃ দিগাঙ্গণার অঙ্গলেপন করিতেছিলেন। .....সাগর অম্বর সদৃশ এবং অম্বর সাগরসদৃশ হওয়ায় সাগর এবং অম্বর নির্বিশেষরূপে এক বলিয়া বোধ হইতেছিল। সাগর অম্বর প্রতিমা ও অম্বরের সাগর বারি সম্পৃক্ত হওয়ায় এবং উভয়েই তুল্যরূপ ক্ষেত্র ও রত্ন দীপ্তি থাকাতেও উভয়কেই তুল্য বলিয়া বোধ হইতেছিল।.....মহাসাগরের ভীমরব ও নিরন্তর সেই ঊর্মিদাস পরস্পর তাড়িত হওয়ায় রণভেরীর ন্যায় সুমহান শব্দ হইতে লাগিল।''(১) অন্যদিকে রামায়ণের ঋতু বর্ণনাও অপূর্ব - প্রায় আধুনিক। আধুনিক বস্তুলীন দৃষ্টিভঙ্গীর পথপ্রদর্শক মনে হয় যেন রামায়ণের কঞ্চিত ছিল। ''.....স্থানে স্থানে বিমল সলিল সমস্ত গৈরিকাদি বিবিধ ধাতু সংযোগে ধূসর, পাণ্ডুর ও অরুণ বর্ণ হইয়া, সর্পের ন্যায় বক্রভাবে পর্বত হইতে ক্ষরিত হইতে লাগিল।''(২) করিবার বিষয় উভয় বর্ণনায় বর্ষাকালের ঋতুরূপ লইয়া যাহা পরবর্তীকালের সংস্কৃত ও বাংলাকাব্যে গভীরভাবেই আসর জাঁকাইয়াছিল। একই রূপে মহাভারতেও অরণ্য নদী পর্বতের বর্ণনা রহিয়াছে কিন্তু উহারা বিশেষত্ব

---

(১), (২) অনুবাদগুলি বর্ধমান মহারাজের ব্যয়ে মুদ্রিত মূল রামায়ণের অনুবাদ গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

বর্জিত ও গতানুগতিক। তাহা হইলেও বিবিধ প্রাকৃতিক চিত্র বর্ণনায় মাঝে মাঝে আশ্চর্য কবিত্বশক্তির স্ফুরণ দেখা দিয়াছে। বর্ষাঋতুর বর্ণনা — "ধরণীতে অর্কপ্রভাজাল তিরোহিত হইল, সৌদামিনির বিমলদ্যুতি বিদ্যোতিত হইতে লাগিল, শস্যাঙ্কুর সকল সমারাঢ়া হইল, দংশ ও সরীসৃপের প্রাদুর্ভাব হইল, ভূমণ্ডল সলিল সিক্ত, শান্ত ও সর্বপ্রাণীর মনোরম হইয়া উঠিল।"(১) আবার কোথাও কোথাও বর্ণনার অতিশক্তি কবিত্বশক্তির প্রকাশে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে যেমন নিসর্গ প্রীতির একটি অতিশক্তির উদাহরণ 'প্রাসাদস্থিত শিখিগণ ও শীলাস্থিত হস্তী ও হরগণ..... মেঘ নিনাদের ন্যায় সেই নিনাদ শ্রবন করিয়া উৎসুকচিত্তে তন্ময় হইয়া শব্দ করিতে লাগিল।"(২) এইরূপে ভারতীয় সাহিত্যের কাব্যধারা বহুতর বিচিত্র প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিসর্গ প্রীতির পরিচয় কালিদাসের কাব্যের ধারায় আসিয়া মিশ্রিত হইল, এবং বেগবান খরস্রোতা কাব্যের বন্যা প্রবাহিনী কলহাসিনী নটী তটিনীতে রূপ লইল।

।। সংস্কৃত সাহিত্য ।।

সংস্কৃত সাহিত্যের সুদীর্ঘকালের ক্লাসিক রচনায় প্রকৃতি চেতনার স্বাদে ও সৌরভে, রস ও রহস্যে সজীব প্রাণধর্মে ঋদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। রামায়ণে, মহাভারতে, উত্তর রামচরিতে, মেঘদূত, শকুন্তলায় প্রকৃতির যে নিত্যনতুন কঠিনে কোমলে, রুদ্রে মধুতে মিশান যে প্রকৃতির রূপ উন্মোচন হইয়াছে তাহা বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদেরও হিংসার বস্তু।

---

(১) অনুবাদগুলি বর্ধমান মহারাজের ব্যয়ে মুদ্রিত মূল রামায়ণের অনুবাদ গ্রন্থ হইতে গৃহীত। পৃ ৪৮

(২) আধুনিক বাংলা কাব্যে প্রকৃতির পরিচয়, অমিয় কুমার সেন, প্রথম সংস্করণ। পৃঃ ৪৮ - ৪৯

এই কাব্য ধারায় প্রকৃতিকে মানবজীবনের সুখদুঃখে প্রেম-বিরহে, বেদনার প্রেক্ষাপটে অথবা হৃদয়বৃত্তিকে উদ্দীপন বিভাব হিসাবেই ব্যবহার করা হয় নাই — চেতন সত্তারূপেও কবিরা অনুভব করিয়াছে। এই অনুভূতি যেমন উচ্চারিত হইয়াছে বৈদিক ঋষিদের স্তবমন্ত্রে তেমনি ভিন্ন আঙ্গিকে বা ভিন্ন শিল্পরীতিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে ... কালিদাসের পূর্ণাঙ্গ কাব্যগুচ্ছে। এই সমস্ত কাব্য ধারায় প্রকৃতির বস্তুনিষ্ঠ আবেদন মুখ্য হইলেও নরনারীদের ব্যক্তি মনের রক্তরাগ স্পর্শ হইতে কখনই তা বঞ্চিত নয়। কালিদাস প্রধানতঃ রূপ-সৌন্দর্য পিয়াসী, তাহার কাব্যে তিনি সর্বত্রই অপরূপ সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন। সেই প্রকৃতির ফল ফুল তরুলতা চন্দ্র সূর্য অরণ্যানী তাহাদের বহুতর বৈচিত্র্য লইয়া কালিদাসের মনে এক সৌন্দর্য সৃষ্টির উদ্দীপন বিভাব রূপে কাজ করিয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যের ধারায় এই প্রকৃতি চেতনা কালিদাসের কালে অনেকটা সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। এবং সেই কারনেই কালিদাসের কাব্যে নিসর্গ প্রীতির সুছন্দ সৌন্দর্যানুভূতি সজীব হইয়া উঠিয়াছে। যদিও প্রকৃতির মধ্যে ব্যক্তি পুরুষের আবির্ভাব বৈদিক সাহিত্যিকদের মত তখনও অবলুপ্ত হয় নাই। শকুন্তলা নাটকে বনভূমির প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলির সজীব জীবের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। শকুন্তলার বিদায় দৃশ্যে মঙ্গল কর্মের উপযোগী যৌথ বসন দান করিয়াছে চন্দ্র পাণ্ডু লোধ্র বৃক্ষ, আবার কোন বৃক্ষ চরণ পরাগ অলক্ত রস ক্ষরণ করিয়াছে, অন্যান্য তরুও যেন নিজেদের রক্তিম কিশলয়ে নানা আভরণ দান করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। কালিদাসের রূপকাত্মক এবং প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপ ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইহা নিছক বাস্তব

বর্ণনা নহে — কল্পনার জারক রসে ইহা অপূর্ব কাব্যরসে স্বাদসমন্বিত। হিমালয়কে কালিদাস যে অপূর্ব কাব্যরসের তুলিতে সজ্জিত করিয়াছেন তাহা এই ধারণাকে দৃঢ় করিয়াছে।

'যশ্চাপ্সরো-বিভ্রম-মণ্ডনানাং সম্পাদয়িত্রীং শিখরৈর্বিভর্তি।
বলাহক-চ্ছেদ-বিভক্ত-রাগামকাল সন্ধ্যামিব ধাতুমত্তাম।' (১)

কল্পনার সঞ্চলনশীল রমণীয় একটি ধারায় হিমালয়ের রূপ বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের নিবিড় যোগাযোগের সন্ধান কালিদাসের কাব্যকে বিচিত্রভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে। 'রঘুবংশে'এ প্রকৃতিকে অনুভূতিশীল করিয়া আঁকিবার প্রয়াস এবং সিদ্ধি গভীরতম রূপলাভ করিয়াছে।

'যস্মিন মহীং শাসতি বর্ণিনীনাং নিদ্রাং
বিহারার্ধ পথে গতানাম।
বাতোহপি নাস্রংসয়দংশুকানি কো
লম্বয়েদাহরণায় হস্তম।।' ২

আবার ঋতুরাজের সহিত কালিদাসের গভীর সম্পর্কের কথা সর্বজনবিদিত।

'শ্বসিতি বিহগবর্গঃ শীর্ণ-পর্ণ-দ্রুমস্থঃ
কপিকুলমুপযাতি ক্লান্তমদ্রের্নিকুঞ্জম্।
ভ্রমতি গবয়যূথঃ সর্বতোহস্তোয়মিচ্ছঞ্চরভকুল
মজিহ্মং প্রোদ্ধরত্যম্বু কূপাৎ।।' ৩

কালিদাস অপর সুনির্বাচিত শব্দের দ্বারা চমৎকার কবিত্বের স্পর্শে প্রোজ্জ্বলিত দাবাগ্নির এবং প্রকৃতির শ্রীহীন মূর্তি একটি স্বাভাবিক অথচ সার্থক কাব্যিক বর্ণনা দিয়াছেন। আবার তিনি সেই

---

(১) কুমার সম্ভব। বাংলাকাব্যে প্রকৃতির রূপ। অমিয় কুমার সেন। প্রথমসংস্করণ, পৃঃ ৭০
(২) রঘুবংশ। বাংলা কাব্যে প্রকৃতির রূপ। অমিয় কুমার সেন। প্রথমসংস্করণ। পৃঃ ৬৪
(৩) ঋতু সংহার। বাংলাকাব্যে প্রকৃতিরূপ। প্রথম সংস্করণ। পৃঃ ৭২

একই গ্রীষ্মঋতুকে ভোগ লালসার ঋতুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কবি কালিদাস ঋতুর বর্ণনায় বর্ষঋতুকে দেহাতীত অনির্বচনীয় অশরীরী প্রেমের অপূর্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এইখানে দেশ কাল ও পাত্রের ঊর্ধ্বে সমগ্র মানব হৃদয়ের অব্যক্ত অকথিত অথচ ব্যাকুল আর্তির গভীর সংবেদনশীল রূপ দিয়াছেন। মানবমনের মিলনাকাঙ্খা বিরহী হৃদয়ের চিরন্তন ক্রন্দনে ভরা এবং আশ্চর্য আকুতি, কল্পনার অবাধ সঙ্কলনে সম্পৃক্ত। মেঘদূত সেই সারা বিশ্বের প্রেমিক হৃদয়ের এক লিখিত চিরন্তন দলিল। প্রেম, অনুরাগ, বিরহ অথবা মিলন সকল বর্ণনাতেই কালিদাসের প্রকৃতি নির্ভর রূপক অপরূপ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছে।

"পয়োধরৈর্ভীম-গভীর-নিস্বনৈ-স্তড়িদ্ভিরুদ্বেজিত-চেতসো ভৃশম্।
কৃতাপরাধানপি যোষিতঃ প্রিয়ান্ পরিষ্বজন্তে শয়নে নিরন্তরম্।"[১]

প্রকৃতি প্রীতি কালিদাসের প্রতিভার একটি বিশেষ ধর্ম। কালিদাস তাঁহার পরিণত বয়সে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা করিয়াছেন — তাঁহার দৃষ্টিতে এই বিপুলা পৃথিবী যেন একটি সুবিস্তীর্ণ ঋতুরঙ্গশালা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন —

2. "In Meghaduta he describes rainy season, in Sakuntala the Summer, Vikramorvasi the winer, in Kumarsambhava the untimely spring, in Malavikagnimitra the spring in a royal garden and in Raghuvamsa almost all the seasons. He describes the Summer in the 16th, the rains in the 12th, the Autumn in the 4th, and the spring

(১) ঋতুসংহার। বাংলা কাব্যে প্রকৃতির রূপ। প্রথম সংস্করণ, পৃ: ৭৩

(২) Kalidasa : chronology of his works and learning (Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Vol. II, Pt. II, p-184.

in the 9th Canto. But the germs of all these magnificient descriptions are to be found in the Ritusamhara. There cannot be least shadow of a doubt that all the seven Poems are by the same great poet and it is a matter of congratulation that with a careful and deep study of his works the number of those who held that all the books were not by one man is diminishing rapidly".

ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস নিবন্ধে ঋতুসংহার সম্বন্ধে যুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন –

১) 'Perhaps no other work of Kalidasa's manifeste so strikingly the poet's deep sympathy with nature, his keen powers of observation, and his skill in dekicting an Indian landscape in vivid colours'.

২)'কালিদাস তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার যুক্ত করিয়া দিয়া এই শব্দ স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধময় পৃথিবীর মাধুর্য অন্তরে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার সেই অনুভূতি সংগীতের ন্যায় বিমোহিনী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে 'মেঘদূত' প্রকৃতি বর্ণনায় কালিদাস অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহা স্বাভাবিক বটে। কেননা, মেঘদূত কালিদাসের পরিণত রচনা। 'ঋতুসংহারে' কবি যেন প্রকৃতি হইতে দূরে রহিয়াছেন, তিনি যেন একজন সুনিপুন অথচ উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র – যেমন যেমন দৃশ্য দেখিতেছেন, তেমনই তিনি প্রিয়ার নিকট তাহার হুবহু বর্ণনা দিয়া চলিয়াছেন, কবি তাঁহার নিজের সত্তা এখনও প্রকৃতি সত্তায় লীন করিয়া দিতে সক্ষম হয় নাই। কিন্তু 'মেঘদূতে' পূর্বমেঘে প্রকৃতির যে জীবন্ত বর্ণনা

---

(১) Sanskrit literature, P-317, Keith.
(২) কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ।বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। প্রথম সংস্করণ। পৃ ২০

পাই তাহা পড়িয়া মনে হয়, যেন কবি প্রকৃতির সহিত নিজেকে অভিন্ন করিয়া দিয়াছেন। 'মেঘদূতে' 'রঘুবংশে' বা 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে কবি সত্যই জড় ও চেতনের মধ্যে বিভেদ যে বিস্মৃত হইয়াছেন।'' সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন —

১) **'It is hardly true to say that he (Kalidasa) ~~pers~~ personifies rivers and mountains and trees, to him they have a conscious individuality as true and as certainly as animals on men or Gods. Fully to appreciate Kalidasa's poetry one must have spent some weeks atleast among wild mountains and forests ~~untouch~~ untouched by man, there the conviction grows the trees and flowers are indeed individuals, fully conscious of a personal life and happy in that life".**

মেঘদূতের মতই ঋতুসংহার, কুমার সম্ভব ইত্যাদি কাব্যে প্রকৃতির বর্ণনাকেও তিনি কাব্য সুষমামণ্ডিত করিয়াছেন। এবং ঋতুর প্রবাহে গ্রামবনের অভিসারী সম্ভোগ সুখের দৃশ্য বর্ণনা করিতে যাইয়া নিসর্গ চিত্রেরও সুন্দর উপস্থাপনা করিয়াছেন। কালিদাস তাঁহার কাব্যধারায় বসন্তকে মদনসখারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বসন্ত ভোগ ও বিলাসের ঋতু। কালিদাসের সমসাময়িক কবি ভবভূতি ও উত্তররামচরিতের স্রষ্টা। ভবভূতিও নিসর্গ চিত্রের বর্ণনায় তপোবনকে কালিদাসের মতই জীবন্ত চরিত্র চরিত্রের সমষ্টি হিসাবে আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতির বা নিসর্গ চিত্রের সাহিত্যিক উদ্দীপন বিভাব হিসাবে বৈদিক যুগ হইতে রামায়ণ মহাভারত পর্যন্ত একটি যুগ এবং

---

(১) Haraprasad Sastri, JBORS, Vol.II 1916, P-280

কালিদাস পর্যন্ত আর একটি যুগ ধরা যায় এবং কালিদাসের পরে বৈষ্ণব ও মধ্যযুগকে একটি যুগ ও তাহার পরে আধুনিক যুগ বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণকে ধরা যায় তাহা হইলে এই পর্যায়ে কালিদাসের সম্পর্কিত আলোচনায়, বিভূতিভূষণের নিসর্গ প্রিয়তায় ভারতীয় সাহিত্যের ধারার অভিন্নরূপটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যদিও বানভট্ট অনুরূপ উক্তি করি, জয়দেব প্রভৃতি বহুকবিই বাংলা সাহিত্যকে, বাংলা সাহিত্যের নিসর্গ প্রিয়তার বা নিসর্গ চেতনাকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করিয়াছে – তাহা হইলেও এই সমস্ত কবিগণ কোন উল্লেখযোগ্য নতুনত্বের পরিবাহী নয় – যদিও বানভট্ট প্রকৃতির প্রকৃতিকে বহুবিধরূপে একই রঙকে বহুবিধ রঙে দেখিয়াছেন তবুও বানভট্টের অনুসারী বাংলা সাহিত্যে কোন কবি বা সাহিত্যিক নাই। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি প্রিয়তায়, নিসর্গ একাত্মতায় বৈদিক কবি বা কালিদাস যেমন প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, পরবর্তী আর কোন কবি মনে হয় তেমন আর পারেননাই। বিভূতিভূষণের দার্শনিক চিন্তা যেমন উপনিষদের দ্বারা প্রভাবান্বিত, তাঁহার লোকচিন্তা বা নিসর্গ চিন্তা বৈদিক সাহিত্য বা কালিদাসের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত। বিভূতিভূষণ বলিয়াছেন (১)'চেতনার অনন্ত প্রবাহে জীবন একটি বুদ্বুদমাত্র।' ভারতীয় বৈদিক সাহিত্যের প্রকৃতির রূপ বর্ণনায় ভিন্ন আঙ্গিকে ভিন্ন শিল্পরীতিতে অপূর্ব মননের সাহায্যে রসময় করিয়া তুলিয়াছেন।

(২)'যখাকাল এখানে অচঞ্চল, স্তব্ধ মৌন বনস্পতি শ্রেণীর মত ধ্যান সমাহিত। এই আকাশ, এই নির্জন সন্ধ্যা, এই নিশীথ রাত্রি, এই গভীর অরণ্য যেন কি কথা

---

(১) বিভূতিভূষণের নিজের উক্তি। স্মৃতিরেখা।

(২) হে অরণ্য কথাকও (তৃতীয় মুদ্রণ), পৃঃ ৫৪-৫৫

বলছে – সে শব্দহীন বাণী ওই বন্য নদীর চঞ্চল কলধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠছে প্রতি ক্ষণে – কিংবা গভীর অরণ্য নিঃশব্দতার সুরে সুর মিলিয়ে অন্তরাত্মার কানে তার সুগোপন বাণীটি পৌঁছে দিচ্ছে। চুপ করে বসে জলের ধারে আকাশের দিকে চেয়ে, চাঁদের দিকে চেয়ে, বনস্পতি শ্রেণীর মধ্যে জ্যোৎস্নালোকিত শীর্ষদেশের দিকে চেয়ে সে বাণীর জন্য চোখ বুজে অপেক্ষা করে। – শুনতে পাবে। সে বাণী ত নৈঃশব্দ্যের বটে, কিন্তু অমরতার বার্তা বহন করে আনছে। এই অরণ্যই ভারতের আশ্রমরূপ, সভ্যতার জন্ম হয়েছে এই অরণ্য শান্তির মধ্যে, বেদ, আরণ্যক, উপনিষদ জন্ম নিয়েছে এখানে – এই সমাহিত স্তব্ধতায় – নগরীর কলকোলাহলের মধ্যে নয়।[১] আবার তিনি উপনিষদের বাণীকেই সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন একটি প্রকৃতি নির্ভর সুপ্রাচীন পর্বত গুহার মধ্যে তিনি প্রাণের সাথে সকল প্রাণীর উর্ধ্বে অবিনশ্বর রূপে কল্পনা করিয়াছেন – (১) 'যখনি পূর্বে রাত্রি রোদ যেমন আছে, তেমনি কত লক্ষ কোটি, লক্ষ কোটি সূর্যাস্ত, সূর্যোদয়, লক্ষ কোটি লক্ষ কোটি পূর্ণিমা অমাবস্যা দেখেছে এই সুপ্রাচীন পার্বত্য-গুহা-যার তুলনায় বেদ-পাঠ রচয়িতা ঋষিরা, উপনিষদের কবি দার্শনিকেরা, বেদব্যাস, বাল্মীকি, বুদ্ধ, কপিলবস্তু, অশোক, কলিঙ্গযুদ্ধ কালকার কথা।'

বৈদিক সাহিত্যে যে যুগে দর্শন চিন্তা সর্বাধিক প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল, সেই যুগের সর্ববাণীতে যাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহা হইল বিশ্বব্যাপী প্রাণচেতনার কথা। এই প্রাণচেতনায় নিত্যকালীন অচ্ছেদ্য যোগসূত্র রচনা করিয়াছে, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবসত্তার মধ্যে। যে অনুভব চেতনা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল তাহার উত্তরসূরী হিসাবে বিভূতিভূষণে প্রকৃষ্টরূপে পরিবাহিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের আর কোন কালিদাসোত্তর সাহিত্যে

১) হে অরণ্য কথাকও। (তৃতীয় মুদ্রণ), পৃঃ ৬৫।

তাহা দেখা যায় নাই। ইহার একমাত্র কারণ আদিম প্রকৃতি হইতে মানুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। ইহার সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পরে হইতে পারে। কিন্তু বর্তমান আলোচনার প্রসঙ্গে ইহার সুযোগ ও পরিসর খুবই সীমাবদ্ধ। তবে বাংলা সাহিত্যের উপর এবং বিশেষভাবে বাঙালী সাহিত্যিকদের উপর বৈষ্ণব সাহিত্যের গভীর প্রভাব বিদ্যমান থাকায় এবং মঙ্গলকাব্যগুলির সাহিত্য রসবিচারে, সাহিত্যচিন্তা ও সাহিত্যভাবনায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারী বলিয়া ইহাদের আলোচনার প্রয়োজন আছে।

।। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য ।।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যে নিসর্গ চেতনায় বৈদিক ঋষিদের পুঙ্খিত শিল্পমাধুরীর কোন পরিচয় নাই। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কবিতাগুলি নিসর্গ চিন্তা প্রকৃতপক্ষে ছিল জীর্ণ ও রসহীন। কিছু কিছু কাব্যে সংস্কৃত সাহিত্যের শ্লোক অনুসরণে রচিত হইয়াছিল প্রকীর্ণ শ্লোক, কিছু প্রাকৃত ও অবহট্ট কবিতার সংকলন। এইগুলি সবই ছিল একঘেয়ে যান্ত্রিক ধরণের - যদিও ইহারা তথাকথিত নিসর্গ পদবাচ্য ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মশাসিত বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতির আশ্চর্য ঐন্দ্রজালিক চিত্রের দিকে মহিমময় দৃষ্টির চমৎকার কোন প্রতিভার স্ফুরণ হয় নাই। যে কোনো প্রতিভার দ্বারা নিসর্গের রস সম্ভোগ সম্ভব তাহা এই সবই কবিদের মধ্যে প্রায়ই ছিলনা। তাহা হইলেও চর্যাপদ হইতে সুরু করিয়া বৈষ্ণব কবিদের বা তাহার পরে ও অষষ্টাদশ শতাব্দীয় মধ্যযুগীয় কাব্যসম্ভারে প্রকৃতি চেতনার রূপ বিচ্ছুরিত দীপশিখার অকম্প রূপ লইয়া মাঝে মাঝেই দেখা দিয়াছে।

চর্যার একটি পংক্তি –

(১) নানা তরুবর মৌলিরে
গঅনত লাগেলি ডালি।

এই কবিতাটি নিসর্গ চিন্তায় চমক দিবার মত। শুধু বর্ণনামূলক নিসর্গ চিত্রই চর্যাপদের বহুস্থলে ছড়াইয়া রহিয়াছে। উহার মধ্যে মুখ্য হইল বসন্ত ঋতু। ইহারা ধর্মচেতনার অনুষঙ্গ হিসাবেই আসিয়াছে – কিন্তু নরনারীর হৃদয়ানুভবের সহিত নিসর্গ চিত্রের বা ঋতু বৈচিত্র্যের কোন হৃদয় সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই। মঙ্গলকাব্যে কিন্তু সর্বত্র না হইলেও ক্বচিৎ ফুল্লরার বারমাস্যায় প্রকৃতিকে শৃঙ্গার রসের উদ্দীপন বিভাবরূপে দেখা গিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের ঋতু সংহার এই প্রসঙ্গে উপমেয়। বারমাস্যায় প্রকৃতি বিরহিনী ধুল্লনার ক্বচিৎ অভিব্যক্তি – যদিও ইহা ঋতু সংহারের সমার্থক নহে বা নিসর্গ চেতনায় রসবোধে সমতুল্য নয়, তবুও নিসর্গের রসসম্ভোগ এইখানে প্রকৃতিকে মানুষের সহিত খানিকটা একাত্ম করিয়া তুলিয়াছে। এইরকম কয়েকটি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঈষৎ স্মৃতির ক্ষেত্র ছাড়া মঙ্গলকাব্যের নিসর্গ চিন্তা উপস্থাপিত হইয়াছে মাত্র – কিন্তু এই নিসর্গ চেতনা নরনারীর ব্যক্তিস্বনের রঙরাগ স্পর্শ বঞ্চিত। অপরদিকে শৃঙ্গার রসের উদ্দীপন বিভাবরূপে নিসর্গ চেতনায় বৈষ্ণব সাহিত্যে কোন [illegible] প্রতিভা না থাকিলেও মেঘে মেঘে গুরুগুরু রাত্রি এবং বর্ষার বায়ু তাড়িত ঝাপটার মধ্যে বিজলির ঈষৎ চমক কিংবা বসন্ত ঋতু শুধুই পূর্ণ বর্ষা – এইরকম অনেক নিসর্গ চিত্রই শৃঙ্গার রসের পটভূমিরূপে চিত্রিত হইয়াছে।

---

(১) চর্যাপদ - ২৮ সংখ্যা। অনীন্দ্র মোহন বসু, সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ। পৃঃ ১০৪

যদিও বৈষ্ণব কবিতার বিভিন্ন নির্দিষ্ট অংশগুলির প্রায় সর্বত্রই প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে — কেবলমাত্র প্রেমিক প্রেমিকার মিলন বিরহের উদ্দীপন বিভাবরূপে প্রকৃতি তাহার আপন কোন মুক্তস্বতন্ত্র রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠে নাই। ইহার কারণ বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মহিমাকে যতটা ভক্ত হৃদয় লইয়া দেখিয়াছিলেন ততটা চারিপাশের নিসর্গ সৌন্দর্যের অপরূপ রূপের মহিমাদ্বারা প্রভাবান্বিত হয় নাই। যদিও রাধা ও কৃষ্ণের রূপবর্ণনা প্রায় সমধর্মী প্রকৃতিচিত্র হইতে আহৃত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে —

(১) ওষ্ঠ অধর যেহ্ন যমুন পৌয়ার।
কণ্ঠযুগ পেতে যেহ্ন বরুণের জাল।।
ভুজযুগ করিকর জানুত নুনে।
কর কুরু বিন্দমান নির্মিত কমলে।।
ক্ষীণমধ্য রামরম্ভ জঘেযুগল।।
মানিক রচিত চন্দ্রসম নখপাতী।
সজল জলদরুচি জিনি দেহকান্তী।।

কুরুবিন্দমান, নির্মিতকমলে, জলদরুচি জিনি, দেহকান্তি, রামরম্ভ, সংস্কৃত সাহিত্যের উপমার সহিতই উপমেয়। আবার বিদ্যাপতিতে আছে কৃষ্ণেরই রূপ বর্ণনা —

(২) অধর সুরঙ্গ জনি নিরমল পবার।
দুধক পরসে পবার ধবল ভেল।

রাধিকার উক্তি হইতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় যে নিসর্গ চেতনার প্রভাব দেখা দিয়াছে তাহা সংস্কৃত সাহিত্যের অনুসারী বলিয়াই মনে হইবে। সিঁদুর বিন্দুর সহিত নবোদিত সূর্য এবং

---

(১) মধ্যযুগের কবি ও কাব্য। শর্করী প্রসাদ বসু। তৃতীয় সংস্করণ। পৃঃ ৭২

(২) বিদ্যাপতি পদাবলী। খগেন্দ্র নাথ মিত্র। বিমান বিহারী মজুমদার। প্রথম মুদ্রণ। পৃঃ ৩৫

চন্দনের ফোঁটার সহিত চন্দ্রের তুলনা বৈষ্ণব সাহিত্যের বহুস্থলেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। মুকুন্দরামও প্রকৃতির [illegible] এই রূপকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন –

(১) ললাটে সিন্দুর তিমির করে দূর
যেন প্রভাতের ভানু।
চন্দনের বিন্দু তাহে কিবা ইন্দু
ইথে একলঙ্ক তনু।।

এইরূপ প্রকৃতিচিত্র হইতে আহরিত রূপ ও বর্ণনা রাধিকার ক্ষেত্রেও রহিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের অন্যস্থানে –

(২) 'শিরীষ কুসুম সম তাহে কৌমলী।।

এইখানে নায়িকার কোমল অঙ্গের সহিত শিরীষের তুলনা করা হইয়াছে। আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি মেঘকুন্তলের দেহে চম্পকরূপ বিদ্যুতের দ্যুতি চিত্রিত করিয়া নিজস্ব কবিচেতনার পরিচয়ে কবি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

(৩) 'নীল জলদসম কুন্তল ভরা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা।।
শিখিত শোভএ তোর বহে সিন্দুর।
প্রভাত সময় যেন উয়ি গেল সুর।।'

যদিও এই ধরনের অলঙ্কারের বাহুল্যে এবং বার বার একঘেয়ে বহুল ব্যবহারে বহুস্থানে কাব্যিক রসের হানি হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও নিসর্গ চিত্তার রূপময় অবদান এই সাহিত্যের বহুস্থানেই ছড়াইয়া আছে। [illegible]

---

(১) চণ্ডীমঙ্গল। সুকুমার সেন সম্পাদিত। প্রথম সংস্করণ, ১৩৮২, পৃঃ ৫৮

(২) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : মধ্যযুগের কবি ও কাব্য। শচীন্দ্র প্রসাদ বসু। তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৫৮

(৩) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মধ্যযুগের কবি ও কাব্য। শচীন্দ্র প্রসাদ বসু। তৃতীয় সংস্করণ। পৃঃ ৩৫

[illegible]। আবার বৃন্দাবনখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'দেখোঁ মো তোর এ ফুল শরীরে।' ইহার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার যৌবন ভিক্ষা করিয়াছেন এবং রাধিকার প্রতিটি অঙ্গের বর্ণনায় এক একটি পুষ্পের তুলনা করিয়াছেন। ইহার সহিত একমাত্র তুলনা করা যায় 'বসন্ত পুষ্পাভরনং বহন্তী' মত কালিদাসের কৃতিত্বপূর্ণ পার্বতীর রূপবর্ণনা।

আবার রামায়নে যখন সীতাকে রাবণ অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল তখন সীতার কণ্ঠসংলগ্ন মতিমালা ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছিল তখন কবি বাল্মিকী তাহাকে গংগার সহিত তুলনা করিয়া ছিলেন একইরকমভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধিকার বক্ষস্থিত হারের তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে 'যেহন শোভাকার সুমেরু পঙ্গার ধারে।' আবার বিদ্যাপতি ও পিনপয়োধরের উপর অপরূপ সুন্দর মতির হারের বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, 'ভনি কনকাচলক উপর বিমল জল দুই বহু সুরসরি ধার' মুকুন্দরাম বর্ণনা করিয়াছেন —

(১) 'তোর কুচে অনুপাম মনিমুকুতার দাম
মেরুশৃঙ্গে বহে মন্দাকিনী।'

বিদ্যাপতি নরনারীর রূপ বর্ণনায় প্রকৃতির বহুতর উপমা ব্যবহার করিয়াছেন — উপমা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কালিদাসের পরেই বিদ্যাপতির স্থান। কিন্তু বিদ্যাপতির উপমাগুলি বহু ব্যবহারে ইহা পূর্বেই মলিন হইয়া গিয়াছিল — তিনি তাঁহার অপরূপ সৃষ্টির কারিগরির

---

(১) চণ্ডীমঙ্গল: সুকুমার সেন সম্পাদিত। প্রথম মুদ্রণ, পৃ ১৫১

শক্তিতে ঐ উপমাগুলির রূপ ও বিভূতির মালিন্যকে প্রভূত ঔজ্জ্বল্য দান করিয়াছেন।

(১) 'লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার,
মধু মাতাল কিরে উড়ই পার।'

এইখানে বহু ব্যবহৃত লোচনের সহিত ভ্রমরের তুলনাকে তিনি অপূর্ব শিল্পশৈলীর দ্বারা নতুন চিত্ররূপ দান করিয়াছেন।

(২) নীরস কমল মুখ অবলম্বই সখিমাঝে
বৈসলি গোই
নয়ন নীর থির বান্ধাই পঙ্ক
কয়ল মহীরোই।'

এই উদ্ধৃতিটিতে সুখকমল এবং দেহমৃনালের সহিত একটি প্রাচীন উপমার ব্যবহার হইয়াছে। কিন্তু ইহা চিরকালই নতুন বলিয়া প্রতিভাত হইবে। বিরহীখিন্না নায়িকার সহিত নীরস কমলের মধ্যে কবিরা বহুবার খুঁজিয়া পাইয়া যেন তাহার মধ্য হইতে কমলের সৌরভ ও কমলের ঔজ্জ্বল্যকে হারাইয়া বহুব্যবহারে এই অলঙ্কারটি মলিন হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কালিদাসের মতই বিদ্যাপতি নীরস কমলের মধ্যে বিরহী খিন্না রূপের উপমা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রকৃতিচিত্র বিদ্যাপতিকে গভীরভাবেই প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। যদিও ইহা তাহার নিসর্গ প্রিয়তার অবলম্বীরূপ হিসাবেই আসে নাই — ইহা উদয় হইয়াছিল নায়ক নায়িকার বিরহ মিলন চিন্তার উদ্ভাবকরূপে। যেমন তিনি ভীতি বা ক্রোধের সঞ্চারে নারীর কম্পমান দেহকে নবকদলীপত্রের চঞ্চলার সহিত সংস্কৃত সাহিত্যিকদের মতই ব্যবহার করিয়াছেন। রামায়ণেও সীতা দেহ ক্রোধে কদলীপত্রের মতই কম্পমান হইয়াছিল যখন রাবণ সীতাকে উদ্ধৃত প্রস্তাব দিয়াছিল। জয়দেবের আদর্শেই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কবি বা বিদ্যাপতি

---

(১) বিদ্যাপতির একটি পদ। মধ্যযুগের কবি ও কাব্য। শঙ্করী প্রসাদ বসু। তৃতীয় সংস্করণ পৃ: ২৫
(২) বিদ্যাপতির পদাবলী। খগেন্দ্রনাথ মিত্র। বিমান বিহারী মজুমদার। প্রথম মুদ্রণ। পৃ: ৪৩১

নির্বিকার নিরপেক্ষ বর্ণনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতি ও গোবর্দ্ধনদাসের পক্ষ হইতে এই নির্বিকার প্রকৃতি বর্ণনার কাব্যসৌন্দর্যকে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। বিদ্যাপতির কাব্যে প্রকৃতির সহিত প্রাণের সম্পর্ক ঘটে নাই। কবি হিসাবে বিদ্যাপতি প্রকৃতির প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া উঠিতে পারে নাই। যদিও ঋতু বর্ণনায় বিদ্যাপতির স্থান অনেক উচ্চে। বিদ্যাপতি ছিলেন ভোগ ও বিলাসের কবি তাই বসন্ত বর্ণনায় তাহার কবিত্ব চরমে উঠিয়াছে।

(১) আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবী-পন্থ।

প্রকৃতিতে এইখানে জীবন্ত আরোপ করা হইয়াছে। তিনি প্রকৃতির এই পটভূমিতে নায়ক নায়িকার বহুবিধ মিলন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন এমনকি বিরহের চিত্র বর্ণনাতেও বসন্তকে পটভূমি হিসাবে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। বর্ষার রূপ বর্ণনায় কবি অবশ্য একস্থলে গুরু-ত অর্থ লইয়া বর্ষার শুষ্ক রূপকে মানবমনের [redacted] চিরন্তন বেদনার স্পন্দনে অনুরণিত করিয়াছেন —

(১) বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া।

প্রচুর অলঙ্কারের মধ্যে নারীর আপন সমাহিত পল্লীর রূপটি যেমন হারাইয়া যায় — অলঙ্করণের দ্যুতি যেমন সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়া থাকে সেই রূপই বিদ্যাপতির কাব্য সৌন্দর্য বহুস্থলে অলঙ্করণে বৈদূর্যমণি হইতে বিচ্ছুরিত দ্যুতির চোখ ধাঁধানো রূপে হারাইয়া যায়। কিন্তু উপরের পংক্তি দুইটি নিরাভরণা হইয়া কাব্যসৌন্দর্য আপন মহিমায়

---

(১) বিদ্যাপতির একটি পদ। 'বসন্তসময়' মাধুকরী। সম্পাদনা, কালিদাস রায়, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ৯

(২) বিদ্যাপতির একটি পদ। বাংলাকাব্যে প্রকৃতির রূপ। অমিয় সেন। প্রথম সংস্করণ। পৃঃ ১১২।

মানুষের মনের আর্তি বেদনা জাগাইয়া তুলিয়াছে এক চিরন্তন সাহিত্যের শাশ্বত সমাহিত লোকোত্তর রূপ লইয়া। এইখানে বিদ্যাপতি প্রকৃতির প্রতি প্রচুর সহানুভূতিশীল হইয়া তাঁহার সহিত একাত্ম হইয়া উঠিয়াছেন। চণ্ডীদাসও বহুস্থলে প্রকৃতি বা নিসর্গচিত্র অঙ্কনে তাঁহার কাব্য প্রতিভার বেশ কিছু অংশ ভুলিয়া রহিয়াছে। যেমন মিথিলার প্রকৃতিচিত্রগুলি অপূর্ব সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে — সেই রূপই নায়ক নায়িকার বেদনা বিরহে প্রকাশে প্রকৃতির অনুমন্ত্রীরূপে মানব মনের গভীর অনুভূতির আরোপ সার্থক হইয়া উঠিয়াছে —

(১) জাতি কুইন্ যুথি রুইন্ রুইন্ সুগন্ধমালতী
ফুলের বাসে নিদ নাহি আসে পুরুষ মিশুর জাতি।

এইখানে খ্রিষ্টমের আগমন প্রতীক্ষায় রাধিকার প্রতীক্ষমান থাকিয়াও পুরুষ অহার স্বভাব সুলভ নিষ্ঠুর আচরণের দ্বারা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। তিনি এই কবিতার পূর্বের দুই পংক্তিতে মধুর নেশাী ভ্রমরের আনন্দ এবং পুষ্পের সুগন্ধ দ্বৈতের আগমনে রাধিকার নিকট ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে বলিয়া উৎকণ্ঠিত রাধিকা নোত করিতেছে—

(২) 'দুয়ারের আগে ফুলের বাগান কিসের লাগিয়া কলুঁ।
মধু খাই খাই ভ্রমর আগুনে বিরহ জ্বালতে মলুঁ।।'

আবার আর এক স্থলে প্রকৃতিকে অনুভূতির অধিকারিণী করিয়া উদিত চন্দ্রমার সহানুভূতি হীনতার আরোপ করা হইয়াছে —

(৩) 'কহিও বঁধুরে নতি কহিও বঁধুরে।
গহন বিরোধী হৈল পাপ শশধরে।।

---

(১) চণ্ডীদাসের একটি পদ: চণ্ডীদাস রচনাবলী। বিমান বিহারী মজুমদার, সম্পাদিত প্রথম মুদ্রণ, পৃ ৩০২

(২) চণ্ডীদাসের একটি পদ : চণ্ডীদাস রচনাবলী। বিমান বিহারী মজুমদার, প্রথম মুদ্রণ, পৃ ৪২।

(৩) চণ্ডীদাসের একটি পদ। বঙ্গবাসী চণ্ডীদাস রচনাবলী। প্রথম মুদ্রণ, পৃ ২১০

চণ্ডীদাস অবোধ্যাসভরা দুঃখের কবি। বিভূতিভূষণের মতই তাঁহার প্রাকৃতিক পটভূমিও অবোধ্যাসে পরিপূর্ণ। উপনিষদের ঋষি যে উক্তি করিয়াছেন, 'পশ্য দেবস্য কাব্যম্ন মমার।' বিভূতিভূষণের অধ্যাত্মচেতনা নিসর্গ সৌন্দর্য রহস্যে আবিষ্ট দৃষ্টি হইতে সঞ্জাত কিন্তু চণ্ডীদাস মূলতঃ বৈষ্ণবধর্মী এবং কৃষ্ণ ভাবানুযায়ী ও রাধিকার রূপ রহস্যে নারীর বেদনা-লাঞ্ছনা অপেক্ষা লোকোত্তর মহিমাময় রাধাকৃষ্ণ ভক্তিভাবে উদ্দীপিত। সুতরাং তাঁহার কাব্যে বিভূতিভূষণের মিষ্টিক অরূপচেতনা নাই অথবা প্রকৃতির রহস্যলোকের মধ্যে অবগাহন করিবার জন্য দুর্গম দুর্জ্ঞেয় দুরতিক্রম্য পথে পাড়ি দিবার জন্য কোন গভীর প্রত্যয় নাই। ইহা কোন বৈষ্ণব কবির মধ্যেই ছিলনা। অশ্রু হইলেও চণ্ডীদাসের রাধিকা ছিল নীরব এবং বেদনাবিধুর - তাঁহার প্রকৃতি চিত্রও সেইরূপ।

চণ্ডীদাস ছিলেন এক বিষয়ে একটি ব্যতিক্রম, তাহা হইল প্রাকৃতিক উপাদানগুলি অলঙ্করণের আতিশয্যে এবং অনুকৃতির একঘেয়েমিতে তাঁহার পূর্বসূরীদের ন্যায় তিনি বিশেষত্বহীন নন। হয়ত তিনি প্রেমের কবি বলিয়া নিসর্গ রূপবর্ণনায় অলঙ্কারের আতিশয্যে প্রকৃতির প্রেমমূর্তিকে ভারাক্রান্ত করেন নাই। চণ্ডীদাস মূলতঃ বাঙালী কবি ছিলেন। সাহিত্যে প্রাপদী ঢঙে চলতি উপাদানগুলির সহিত তিনি বাঙালীর একান্ত আপনী ভূমিকে আনিয়া ধরিয়াছেন —

(১) নবজলধর করে চলচল বরণ অঞ্জন সম।
নীলতে মুকুর অতসীর ফুল তেমতি দেখয়ে ভ্রম।''

এই হিসাবে বিভূতিভূষণের পূর্বসূরী হইলেন চণ্ডীদাস। দেশজ তুলনাগুলি বাংলার

---

(১) চণ্ডীদাস : চণ্ডীদাস রচনাবলী। বিমান বিহারী মজুমদার। সম্পাদিত, প্রথম মুদ্রণ। পৃঃ ১১১

নানা গ্রাম প্রান্তর হইতে প্রকৃতির আপন সজ্জিত বাগানে ঘুরিয়া তিনি তাহা চয়ন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপকে ময়ূরপুচ্ছের অপূর্ব বর্ণচ্ছটা এবং কণ্ঠের রূপ আরোপ করিয়াছিলেন। আবার ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি বর্ণনা বহুস্থলেই নিসর্গ চিত্রের বর্ণনাগুলিকে অধিকার করিয়াছে।

(১) নয়ন কমল যেন ঢলঢল লোরেতে কোমল আঁখি
যেমন মেঘের বারিখে শ্রাবন তেমতি ধরণ দেখি।।

এইরকম বহুস্থলেই শ্রীকৃষ্ণ কান্তির মেঘনিন্দিত পরিচয় শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গ বর্ণনায় নৈসর্গিক উপমাগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার বাঙালীর একান্ত কুন্দদশন, তিল ফুলনাসা, খঞ্জন ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার রাধিকার অঙ্গ সুষমা প্রস্ফুটিত করিতে যাইয়া চম্পক পুষ্প শিরীষ কুসুম ব্যবহার করা হইয়াছে। কোথাও কোথাও রাধিকার রূপবর্ণনায় তড়িতের সৌন্দর্যের জয় করিয়াছেন বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতে পারে—

(২) 'নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী চমকি চলিয়া গেল।'
(৩) 'শিরীষ কুসুম জিনিয়া কোমল পাছে বা গয়িা পড়ে।'
(৪) 'তড়িৎবরণী হরিণ নয়নী দেখেনু আঙ্গিনা মাঝে।'

অবশ্য এই ধরনের উপমার বহু ব্যবহারে চিত্রগুলি কোথাও মলিন হইয়া উঠিলেও তিনি তাঁহার আপন কবি প্রতিভারগুণে এবং তাঁহার আপন ভাবময় প্রতিভার স্পর্শে পাঠককুলকে চিরকালই উপমাগুলি সমুজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত করাইতে সক্ষম হইয়াছেন। চণ্ডীদাস বাংলাদেশের

---

(১) চণ্ডীদাস : চণ্ডীদাস রচনাবলী। বিমান বিহারী মজুমদার। সম্পাদিত, প্রথম মুদ্রণ, পৃঃ ৩৪৯।
(২) চণ্ডীদাস : .. .. পৃঃ ১০
(৩) চণ্ডীদাস : .. .. পৃঃ ৩০০
(৪) চণ্ডীদাস : .. .. পৃঃ ৩১০

মধ্যে একান্ত নিসর্গ চেতনা অনুষঙ্গী ভাবরূপে দেখা দিলেও কৃষ্ণ বা রাধিকার সঙ্গেই রূপের বর্ণনায় বা বিবিধ অলঙ্কার উপমায় সংস্কৃত সাহিত্যের অনুসরণ করা হইয়াছে। যদিও তিনি অতি ব্যবহারে মলিন উপমাগুলিকে আপন সঞ্জীবনীর তুলির স্পর্শ দ্বারা উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন —

(১) 'রক্ত উৎপল ফুলে যৈছন ভ্রমরবুলে
ঐছন ফিরিয়ে দুটি আঁখি।'

রাধিকার সহিত রতি বিলাসে নিশি জাগরনে শ্রীকৃষ্ণের রক্তিম আঁখির তুলনা করা হইয়াছে। রক্তিম উৎপল ফুলে বার বার ভ্রমর দংশন করিলে যেইরূপ ফুলটি আরও রক্তিম হইয়া উঠে— সারারাত্রিব্যাপী রাধিকার রতি বিলাসে শ্রীকৃষ্ণের আঁখি দুটিও সেইরূপ রক্তিম হইয়াছে। আবার এই নিসর্গচিত্রের বর্ণনাতেই একটি সার্থক কবিত্ব সৃষ্টির উদাহরণ —

(২) 'সুবিশাল আঁখি মানস ভাবিয়া
ছুটিছে মরাল ফুল।'

রাধিকার নয়নের রূপসম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনায় এই উক্তিটি করা হইয়াছে। সংস্কৃত কাব্যে ক্রোধ বা আবেগ রোমাঞ্চিতা নারীর সহিত কম্পমান কদলী পত্রের তুলনা করা হইয়াছে। চণ্ডীদাস তাহার দৃষ্টি প্রকৃতির অন্যত্র সরাইয়া বাঙালীর নিকট বহুপ্রিয় এবং বৈষ্ণবভঙ্গনের নিকট আরাধ্য কদম্ব অথবা মুকুলের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যছিল কর্ণগ্রাহ্যবস্তুকে দৃষ্টি গ্রাহ্য বস্তুর সহিত তুলনা করা। ইহা প্রকৃতির বিবিধ রূপব্যবহারে নিঃসন্দেহে আধুনিক কাব্যের পূর্বসূরী — কারণ ইহা বহুলাংশে রোমান্টিক ভাববাহী।

(১) চণ্ডীদাস : চণ্ডীদাস রচনাবলী, সম্পাদিত, বিমান বিহারী মজুমদার, প্রথম মুদ্রন, পৃঃ ৭৯
(২) চণ্ডীদাস : " " " " " " " "
পৃঃ ২১২

চণ্ডীদাসের প্রকৃতি বর্ণনায় ভাবানুযায়ী প্রকৃতি বর্ণনার উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবানুযায়ী প্রকৃতিচিত্র বর্ণনায় অনুভূতির বহুল ব্যবহারে চণ্ডীদাস অন্যান্য কবিকে অতিক্রম করিয়াছে। দুইটি পংক্তির মধ্যে সার্থক প্রকৃতির আরোপ সম্ভব হইয়াছে যশোদার মিনতির সুরে।

(১) 'পবনে মিনতি বহু সখি।
মন্দ মন্দ বাতাস মুঝাধি।।''

এইখানে নিশিচাঁদ এবং পবন যেন জীবন্ত হইয়া আপন অনুভূতি লইয়া মানুষের সামনে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে আবার গোপিনীগনের ক্রন্দনের সুর শব্দিত হইয়াছে তাহাদের অন্তর আবেষ্টনের মধ্যে এবং চিরাচরিত ধ্রুপদী উপায় ছাড়াইয়া প্রকৃতিতে অনুভূতি আরোপ সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

(২) গগনে দারুণ নিশি।
প্রভাত হইল বাসি।।
নিশি জেরে করিয়ে মিনতি।
ঐছন থাকয়ে তুমি নিতি।।
প্রভাত না হও তুমি চাঁদ।
বেকত্ বহিত পতি ছাদ।।

চণ্ডীদাসের মধ্যে রুদ্ররসের আবেদন তাঁহার প্রকৃতিগত কারনেই ছিলনা। চণ্ডীদাসের রাধা ছিলেন যোগিনীবেশী – সে রাধা ছিল কবির মতই শান্ত গম্ভীর ও উদাসী। মিলনের বর্ণনাতেও তাঁহার প্রকৃতি বর্ণনা ছিল বৈশিষ্ট্যহীন।তবে কোথাও কোথাও তিনি কবি কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন। একস্থানে রাধিকা মিলনের পূর্বে প্রকৃতি রাধিকাকে রাজবেশে সাজাইতেছে, আপন কোলে লালিত পাখিদের সাহায্যে। সাধারণ প্রকৃতি বর্ণনায় তিনি অনেকাংশেই পূর্ববর্তী বর্ণনার

(১) চণ্ডীদাস : চণ্ডীদাস পদাবলী। বিমান বিহারী মজুমদার, প্রথম মুদ্রণ, পৃ ১০৯
(২) চণ্ডীদাস : '' রচনাবলী। '' '' '' '' '' পৃ ৮৯

পুনরুক্তি করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের মানসভূমি প্রতিষ্ঠিতছিল ভাবতন্ময়তা ও ভাবপ্রধান কবিমনের জন্য। বিদ্যাপতির সহিত সংগতি লক্ষ্য করা যায় যেমন বহু প্রকৃতির বর্ণনায় তিনি মিলনকে পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু কামনাময় মিলনাকাঙ্ক্ষার বা সুতীব্র কামকেলির ইংগিত তাহার কাব্যে ছিল না।

প্রভাতের শিশির বিন্দুর টুপ্ টুপ্ করিয়া পড়ার শব্দকে বধূর পদধ্বনির সহিত তুলনা করিয়া প্রেম উন্মাদিনী রাধিকার ব্যাকুলতাকে চণ্ডীদাস সুনিপুণ সার্থক চিত্রনে চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন। বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের মিল হইল বিদ্যাপতি নিসর্গ দৃশ্যের অবতারনায় নিসর্গ দৃশ্যগুলিকে গভীর বর্ণবিন্যাসে এক মহিমময় রূপ দান করিয়াছেন — সেখানে প্রকৃতি নিজেই নায়ক বা নায়িকার ভূমিকা লইয়া প্রকৃতিকে প্রাণবন্ত জীব হিসাবে চিত্রিত করিবার প্রয়াস না লওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতি নায়ক নায়িকা বা উপন্যাসের অনুগামী চরিত্রের সহিত প্রাণোৎসারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। একই রূপ ঋতুর বর্ণনাতেও চণ্ডীদাস সিদ্ধ হস্ত ছিলেন না। তিনি প্রাচীন ও স্বল্প ঋতুর দ্বারাই ঋতুর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আর কোন বাঙালী কবি কেবলমাত্র ভাবের বর্ণনায় একটি বর্ষাভিসারের চিত্র আঁকিতে যাইয়া সার্থক প্রকৃতিচিত্র উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই।

(১)'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বটে।
আঙিনার কোনে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরান ফাটে।।'

বিদ্যাপতির পূর্বসূরী যেমন রবীন্দ্র নাথ তেমনি এখানে চণ্ডীদাসকেও প্রকৃতিচিত্রের

---

(১) চণ্ডীদাস : চণ্ডীদাস রচনাবলী।বিমান বিহারী মজুমদার, পুথিপত্র মুদ্রন, পৃঃ ৪৮

অববাক্তনাময় প্রকৃতি চিত্র উপস্থাপনে নিঃসন্দেহে পূর্বসূরী বলিয়া দাবী করা যায়।

বিভূতিভূষণ চণ্ডীদাসের সরস অবয়ব ব্যঞ্জনা প্রধান সরলভাষার সাহায্যে এবং প্রকৃতিচিত্রনে চণ্ডীদাসকে বিশেষরূপে বিভূতিভূষণের পূর্বসূরী বলিয়া মনে হয়। কারণ বিভূতিভূষণ প্রকৃতিচিত্রনে একান্ত ভাবেই বাঙালী ছিলেন। অন্য বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে চণ্ডীদাসের ভিতর যেমন বাঙালীয়ানার শান্ত সমাহিত সারল্যমণ্ডিত এবং অববাক্তনাময়রূপ দেখা যায় আর কোন বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরাও কম বেশী চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির প্রকৃতিবর্ণনার বিবিধ অনুষঙ্গী মনোভাব লইয়াই প্রকৃতিকে চিত্রন করিয়াছেন – সুতরাং তাঁহাদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা না করিয়াও ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলা কাব্যের পূর্বসূরীদের মধ্যে চণ্ডীদাসের প্রকৃতি বর্ণনা বিভূতিভূষণের প্রকৃতি চিত্রনের সহিত বহু সাদৃশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

।। মঙ্গল কাব্য ।।

মঙ্গলকাব্যের অধিকাংশ বর্ণনায় মধ্যযুগের আর সব সাহিত্যের মতই দেবতার মহিমাকে প্রচার করিবার মানস লইয়া রচিত। এইসব কাব্যগুলি হইতে যতটা সামাজিক ও ঐতিহাসিক সমকালীন উপকরণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় ততটা কাব্যরস খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। এই মঙ্গলকাব্যের নিসর্গ চিত্রে কোন সার্থক কাব্যরসের চিত্র খুঁজিতে যাওয়া নিরর্থক। কিন্তু প্রকৃতি সেইখানেও রহিয়াছে। বারমাসের বিরহ দুঃখ বর্ণনার মধ্য দিয়া মঙ্গলকাব্যের প্রকৃতির রূপ চিত্রিত। অবশ্য এইসব কবিদের মধ্যে প্রকাশভঙ্গীর

বা বাচনভঙ্গীর কিছু কিছু নতুনত্ব ছাড়া কাব্যচিন্তায় বা ভাবনায় অথবা প্রকাশে কোন মৌলিকতা নাই।

(১) 'জিনিয়া বান্দলী পুষ্প অধর সুন্দর।
কনক চম্পক জিনি শোভে কলেবর।।'

ইহা সংস্কৃত বা বৈষ্ণব কবিদের অনুকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। বিদ্যুতের ক্ষণিক দ্যুতির তুলনা নায়িকার চঞ্চল লীলায়িত ভঙ্গীর সহিত অথবা অধরের তুলনায় প্রবালের সহিত কিংবা নায়িকার ঈষৎ স্ফুরিত বক্ষের সহিত পদ্মকুড়ির তুলনা বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে সর্বত্রই ছড়াইয়া আছে। ইহারা শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কবি বিদ্যাপতি গোবিন্দ দাস প্রভৃতি কাব্যে বহুল ব্যবহারে মলিন উপমা। তাহা সত্ত্বেও বিজয়গুপ্তের কোন কোন উপমা কাব্যের ক্ষণিক দ্যুতি বহন করিয়া আনে। বাস্তব বিষয়বস্তুর সহিত প্রকৃতির প্রকৃতিজাত বিষয়ের উদাহরণের বহুল ব্যবহার মঙ্গলকাব্যে লক্ষ্য করা গিয়াছে। ইহার কারণ মঙ্গলকাব্যের কবিগণ প্রকৃতির মধ্যে লালিত মানুষের সুখ দুঃখ বেদনা তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাপঞ্জী পারিপার্শ্বিক চরিত্রের একঘেয়ে পুনরুক্তি করিতে যতটা সক্ষম হইয়াছেন, অনুভূতিশীল অনুভূতিশীল প্রকৃতিচিত্র কিন্তু একেবারেই দেখা যায় না। তবে মাঝে মাঝে প্রকৃতি সহানুভূতিশীল হইয়াছে তাহার চিত্র দেখা গিয়াছে। বিজয়গুপ্তের প্রকৃতি চিত্রনে কবির শব্দচয়ন ও প্রকাশভঙ্গীর কিছু কৃতিত্ব থাকিলেও প্রায় সমস্ত লেখাগুলি গতানুগতিক হওয়ায় — কাব্যরস প্রায়ই খুঁজিয়া পাওয়া যায়না।

---

(১) বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল। বাংলা কাব্যে প্রকৃতির রূপ। প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ১৩৮

(১)'হেনকালে ঋতুরাজ আসিল বসন্ত।।
দুর্লভ বসন্ত ঋতু পরম সুন্দর।
বিকশিত নানা পুষ্প গন্ধে মনোহর।।
মলয়া শীতল বায়ু বহে মন্দ মন্দ।
ভ্রমরা ঝঙ্কার করে পিয়ে মকরন্দ।''

প্রকৃতির বর্ণনায় বিজয় গুপ্তের কোন প্রভাব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক উপাদানে খুঁজিয়া পাওয়া যায়না।

মুকুন্দরাম কোথাও প্রকৃতি অথবা নায়ক নায়িকার মিলন বিরহ অথবা মনোভাবের পটভূমিকায় প্রকৃতি চিত্রকে সঙ্গে রাখিয়াছেন। কিন্তু তিনিও প্রকৃতি চিত্র বর্ণনায় নতুন কোন রীতি বা দৃষ্টিভঙ্গী রচনাশৈলীর পরিচয় দিতে পারেন নি। বৈষ্ণব কবিতায় নিসর্গ সর্বত্র নির্লিপ্ত ছিলনা, প্রকৃতি অনেকক্ষেত্রেই প্রাণবন্ত হইয়া মানব সহচর হইয়া উঠিয়াছে। যদিও তাহা সংস্কৃত ক্লাসিক্‌সে প্রকৃতি বর্ণনায় অন্তরশায়ী সজীব এক সত্তার রূপ লইয়া দেখা দেয় নাই, তবুও ইহা সৌন্দর্য মাধুর্যে রূপ মহিমায় বাংলা সাহিত্যে নিসর্গ চেতনার এক যুগবাহী প্রবাহের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের প্রকৃতির এই উপস্থাপনায় অন্তর্লীন কোন অরূপ চেতনার অভাবই সেখানে দেখা যায় নাই — প্রেম ও প্রকৃতির কোমলরূপের কোন প্রকাশই সেখানে ছিল না। মাঝে মাঝে আত্মীয়তার ক্ষীণ ব্যবহারিকতাতে অনুভূতির বেশ কিছু স্পর্শ হয়তো লাগিয়াছে কিন্তু ব্যবহারিকতাকে উত্তীর্ণ করিয়া প্রকৃতির দৃশ্য সঞ্জাত রূপানুভূতির বর্ণনা সেখানে নাই। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ও বিদ্যাসুন্দর কাব্যেও নিসর্গ চিত্রের বর্ণনায় বা প্রকৃতিপ্রিয়তায় তিনি নতুন কোন বৈশিষ্ট্য

---

(১) বিজয়গুপ্ত : ঋতু বর্ণনার অংশ। বাংলাকাব্যে প্রকৃতিররূপ, প্রথম সংস্করণ, পৃ: ১৪৩

আনিতে পারেন নাই। উপরন্তু অলঙ্কারের বাহুল্যে তাহার স্বরূপ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। অবশ্য এই অলঙ্কার বাহুল্য সেই যুগে বাংলা কাব্যের বৈশিষ্ট্য ছিল। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে যে প্রকৃতি বর্ণনা আছে তাহা কবিত্ব স্পর্শ বর্জিত। তবে ভারতচন্দ্র প্রকৃতি বর্ণনায় কোন প্রতিভাশালী কবি না হইয়াও তিনি স্থানে স্থানে শুধুমাত্র ছন্দ ও শব্দের ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। শুধু ব্যঞ্জনার দ্বারা তিনি পদ্মার একটি অপরূপ চক্ষু ইন্দ্রিয় হইতে কর্ণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ বর্ণনা করিয়া পদ্মাকে প্রাণময় করিয়া তুলিয়াছেন।

(১) 'লটপট জটাজুট সংঘট্ট পদ্মা।
ছলছল, টলটল, কলকল তরঙ্গা।।'

এই বর্ণনায় কবি তরঙ্গের তিনটি গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রবাহ ব্যঞ্জক, উহা হইল জলের ছলছল, নির্মলতা ব্যঞ্জক – জলের টলটল জল, নিক্কন ব্যঞ্জক - জলের কলকল শব্দ। আবার আর এক জায়গায় –

(২) 'ঝাঁকর মাকড় চুল নাহি ঝাঁদি ঝাঁদি।
যত দিনে ধূলা উড়ে যেন কেয়া কাঁদি।।'

এই কাব্যের প্রভাব যতটা পরবর্তীকালের মধুসূদন নাথ বা অন্য কবিদের মধ্যে পড়িয়াছিল, বাংলা সাহিত্যের বিশেষতঃ কাব্যের বর্ণনাভঙ্গীতে একটা বিশিষ্টতা দান করিয়াছিল। এই ভাষার কারিগরি দক্ষতাকে সরাসরি মধুসূদন নাথ যতটা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, বিভূতিভূষণে সেই প্রভাব সংক্রমিত হয় নাই। বিভূতিভূষণ তাঁহার সুতঃ ভাষা ও ভঙ্গিমা লইয়া তাঁহার উপন্যাসকে রূপ দিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের এই প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিদানে মনীষা

---

(১) ভারতচন্দ্র রচনাবলী। সম্পাদিত, বঙ্গেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সজনী কান্ত দাস। প্রথম সংস্করণ। ১৩৫০, পৃঃ ৩১

(২) ভারতচন্দ্র রচনাবলী। সম্পাদিত, বঙ্গেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনী কান্ত দাস। প্রথম সংস্করণ, ১৩৫০, পৃঃ ৫৬

একাধিকক্রমে বিহারীলালের পূর্ব পর্যন্ত চলিয়াছিল। বিহারীলালের প্রকৃতিচেতনার অঙ্কুর রবীন্দ্রনাথের পত্রপুষ্পে সজ্জিত হইয়া বিভূতিভূষণে একটি তপোবনের আকার ধারণ করে। মঙ্গলকাব্যের কবিরা স্বর্গলোকবাসী লইয়া যতটা মাতামাতি করিয়াছেন – স্বর্গলোক লইয়া কারবার করিতে যে বিশেষ শিল্প ও সৌন্দর্য চেতনার প্রেরণা বর্তমান থাকা প্রয়োজন তাহা ~~তাহাদের ছিল~~ তাঁহাদের ছিল না। বিহারীলালের কুণ্ঠিত মনস্ক গ্রাম্য নিঃসঙ্গ প্রকৃতিপ্রেম রবীন্দ্রনাথে প্রচণ্ড আবেগ লইয়া যৌবনোন্মেষ দেখা দিয়াছিল। বিভূতিভূষণে উহা আবার শান্ত সমাহিত রূপ লইয়া প্রকৃতি চেতনার সহিত সংশ্লিষ্ট বিশ্বচেতনা ও চলমানজীবনের চেতনায় উদ্দীপিত এক সুনিবীড় আধ্যাত্মচেতনার প্রকাশে চিরন্তন ভারত আত্মার প্রকৃতি ও প্রিয়তার সুরই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। একদা সাহিত্য জগতে ভারতের নিঃসঙ্গ নিসর্গ প্রিয়তা পশ্চিমের সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের কবিদের মধ্যে গভীর কাব্যিক নিসর্গ প্রিয়তায় বিহারীলাল, রবীন্দ্র নাথ সঙ্গী খুঁজিয়া নইয়াছিলেন। ভারত আত্মার নিসর্গ প্রিয়তা সেদিনের বৈদিক কবিদের প্রকৃতি চিত্রনে যে সৌন্দর্যশোভা লইয়া একদা বিরাজ করিতেছিল– মধ্যযুগের লৌকিক কবিদের প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টিদানের অনীহায়, সেই সৌন্দর্য চেতনা যেন হারাইয়া গিয়াছিল। বিহারীলাল রবীন্দ্র নাথ পশ্চিমী কবিদের নিসর্গ প্রিয়তার অপূর্ব হৃদয়ানুভূতির সৌন্দর্য চেতনার প্রকাশে ভারতবর্ষের নিসর্গ সৌন্দর্য প্রিয়তার হারানোসূত্রের প্রান্তভাগটি যেন খুঁজিয়া পাইয়া আবার ভারতের শাশ্বত চিরন্তন প্রকৃতি নিঃসৃত সৌন্দর্য ধারায় নতুন করিয়া স্নান গাঁথিতে লাগিলেন। প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে নতুন নতুন পত্র পুষ্প চয়ন করিয়া সাহিত্যের কাব্যের ডালাটিকে পূর্ণিত করিতে লাগিলেন, বিভূতিভূষণ সেই ভারত আত্মার হারাইয়া যাওয়া সুরকে রবীন্দ্রনাথ এবং

বিহারীলালের বাঁধা বীণার তারে প্রকৃতির সপ্তসুরের রাগরাগিনী বাজাইয়া বিশ্বলোকে ভারতের প্রকৃতি প্রিয়তার অনুপম সৌন্দর্যলোকের লোকোত্তর সাধনার শ্রেষ্ঠ কবি সাধকরূপে এক শাশ্বত নিসর্গ সৌন্দর্যের সপ্তসুরের ঐশ্বর্যে বিশ্বলোককে একবার ভারত আত্মার বাণী শুনাইতে পারিয়াছেন

।। আধুনিক যুগ ।।

মধ্যযুগের কাব্যগুলিতে প্রভূত লৌকিক ঐতিহ্যের বিস্তারিত চিত্রন রহিয়াছে। এই সমস্ত কাব্যগুলি হইতে তদানীন্তন আচার অনুষ্ঠান, সামাজিক নিয়ম, লোকায়ত সমাজের ধ্যান ধারণা, আর্থিক চিত্র বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সেইযুগের চিন্তা নিমগ্নতা বিশ্বাসও এইসব সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল। লোক বিশ্বাসের নিদর্শন, প্রবাদপ্রধান রূপকথার প্রভাব এবং তদানীন্তন লোকচেতনা – এইসব সাহিত্য হইতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

কিন্তু বাংলাদেশে যেদিন মধ্যবিত্ত নামক এক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল তখন হইতে বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি এক নতুনখাতে প্রবাহিত হইবার ঝোঁক দেখা দিল। অবশ্য এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল মূলতঃ ইংরেজ সাম্রাজ্যের পোড়াপত্তন এবং ইংরেজদের দ্বারা প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে। এই সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলন ঘটাইবার প্রচেষ্টা হইতে থাকে। এই মধ্যবিত্ত সমাজের দ্বারা মধ্যযুগীয় আচার আচরণ, বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া উদার মানবতার মধ্যে নিজে আত্মস্থ হওয়ার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করে। তার সাথে সাথে প্রাচীন আর্যসভ্যতা সংস্কৃতি ও সাহিত্যে নতুন করিয়া মূল্যায়নের প্রবল প্রচেষ্টা সুরু হইয়া যায়। এই সময়েই বৈচিত্র্যময় এই মধ্যবিত্ত সমাজের নতুন চেতনার ফলে বাংলা সাহিত্যের চেহারা রূপান্তরিত হইতে থাকে।

এই সমাজভ্রষ্ট বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকরা ভাব ছন্দ ও মানসিকতার দিক হইতে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের প্রভাব বর্জন করিয়া এক নতুন এক নবচেতনার উন্মেষে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল।

এই যুগের প্রথম কবি ঈশ্বর গুপ্ত। তাঁহার মধ্যে ইংরেজী সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে অভিঘাত এই যুগে পড়িয়াছিল তাহার মধ্যে প্রাথমিক প্রবণতা চোখে পড়ে শিল্পসংস্কৃতি ও জীবন ভাবনার বাস্তবরূপে মধ্যযুগের অবসানে ও পশ্চিমী চিন্তা চেতনার সাময়িক প্রভাবে যে দিনবদলের সূচনা হইতেছিল, ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে তাহার সমগ্র পরিস্ফুটন হয় নাই। কিন্তু গুপ্ত কবির রচনাতেই প্রথম উচ্চারিত হয় যে মানবজীবনের নিছক পটভূমি হিসাবে নয় – প্রকৃতি তাহার আপন স্বাতন্ত্র্যের জোরে কেবল প্রকৃতি যে কবিতার বিষয়বস্তু হইতে পারে তিনি তাহা বলিষ্ঠভাবেই উচ্চারিত করিলেন। তাঁর বর্ণনায় 'ঋতুবর্ণন' পর্যায়ের বিভিন্ন কবিতা এই সম্পর্কে সাক্ষ্য বহন করিবে। তিনি এই নিসর্গ কবিতাগুলি রচনা করিয়াছেন হয় ঋতুর ব্যবহারিক সুখদুঃখের কৌতুক রসসিক্ত বর্ণনা হিসাবে। প্রকৃতির চেতনার অভিঘাত তাহার মধ্যে সঞ্চারিত হইলেও প্রকৃতি সম্পর্কিত বিশুদ্ধ দৃষ্টি সম্পন্ন 'প্রকৃতি চেতনার স্তরে তাহার সাহিত্য কখনই উঠিতে পারে নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে –

(১) 'নিশাকর গুরু করি শিখা মত তার।
স্বরূপ স্বভাব লাভ হইবে তোমার।।'

(২) 'ক্ষণপরে কুমুদের কেশর বিরল।
হত যশ নাহি রস ধসে পড়ে দল।।
শুকাইয়া ধরার হৃদয়ে দেয় ধারা।
ভানবৃন্দ নিরানন্দ মকরন্দ হারা।।'

---

(১) ঈশ্বর গুপ্ত। বাংলা কাব্যে প্রকৃতির রূপ। অমিয় কুমার সেন, প্রথম মুদ্রণ, পৃঃ ১৯২
(২) ঈশ্বর গুপ্ত।''সকলি তোমার।'' বাংলা কাব্যে প্রকৃতির রূপ। প্রথম মুদ্রণ, পৃঃ ১৯৩

এখানে কবি হৃদয়ে প্রকৃতি বিশ্বময়ের অস্তিত্বের অনুভূতির রসে পূর্ণ করিতে পারে নাই।

এই যুগে আর একটি খ্যাতনামা সাহিত্যকার হইলেন কবি মধুসূদন। তিনি প্রকৃতির শান্ত স্তব্ধ সৌন্দর্য সম্ভোগের অবকাশ বোধ হয় খুঁজিয়া পান নাই। তাঁহার কাব্য মূলতঃ আখ্যানধর্মী, বস্তুনিষ্ঠ। তাহা ঘটনা ও চরিত্রের সংঘাত ও সংঘর্ষ এবং অদৃশ্য প্রাণলীলার চঞ্চলে প্রাণবন্ত। মধুসূদন বিস্ময়কর কবি প্রতিভার অধিকারী হইলেও নিসর্গ সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত প্রথানুসারী অলঙ্কারে নির্ভর। তাঁহার কাব্য ছিল' Full of business and of human action' 'তাঁহার প্রকাশের বিশেষ ভঙ্গিমার জন্যই' He cannot stay for description' মহাকবি হোমার সম্পর্কে আলোচনা করিতে যাইয়া শেয়ার যাহা বলিয়াছেন, মধুসূদন সম্পর্কে অনেকাংশে তাহা প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে বাংলা কাব্যে উনিশ শতকে ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের অন্তর্লোকাচারী নিসর্গ চেতনার পূর্ণরূপের উন্মোচন বিহারীলালের পূর্বে দেখা দেয় নাই। যদিও মধুসূদনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নিসর্গ চিত্র যেমন মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গে সীতা ও সরমার সংলাপ অথবা ময়ূরী, কৃষ্ণচূড়া, জলধর, গোধূলি, বিরহিণী শ্রীরাধা সখীর স্থান অধিকার করিয়াছে মধুসূদনের। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে তিনি আলংকারিক রীতির মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। মেঘনাদবধ কাব্যে সীতা সরমার সংলাপের অংশে প্রকৃতির রূপচিত্রটি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও এই বর্ণনা আলংকারিকের রীতিকে অতিক্রম করিয়া বাল্মীকি রামায়ণের সহজ সরল সংবেদশীল নিসর্গ সৌন্দর্যে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। মধুসূদন প্রকৃতির সহিত মানুষের আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থ হইয়াছেন। চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে

দেবদেবী, বট উদ্যানে পুষ্করিণী, তারা, বটবৃক্ষ নামীয় কয়েকটি নিসর্গ বিষয়ক কবিতা থাকিলেও, কবিতাগুলি সমগ্র প্রথানুগ দৃষ্টির অভাবে, কবিতাগুলিতে মধুসূদনের নিসর্গ চেতনা কিছু অন্তর্মুখী মৌলিক চেতনার পরিচয় থাকিলেও গভীর সঞ্চারী হইতে পারে নাই। ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যে সাদা চোখে দেখার যে প্রকৃতিবর্ণনার পরিচয় পাওয়া যায়, আধুনিক যুগের সন্ধি পর্বে এবং প্রকৃতিপ্রেমের ক্ষেত্রে ঈশ্বরগুপ্ত যে নতুন ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, মধুসূদন সেই ইঙ্গিত বহন করেন নাই। মধুসূদনের কাব্যের প্রধান সুর ছিল ক্লাসিকাল যুগধর্মের জন্য প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতে যে সমস্ত বিশেষত্ব মধুসূদনে আশা করা যায়, তিনি সেইগুলি ব্যবহার করেন নাই। বরং তাঁহার কবিতাগুলির প্রকৃতি ভাবসম্পদ এবং প্রকাশভঙ্গীর কালধর্ম হিসাবে আধুনিক ছিল। কিন্তু মধুসূদনের প্রতিভার ঐশ্বর্যের জন্য কখনও কখনও প্রকৃতি সম্পর্কিত কাব্যিক বর্ণনায় বেশ কিছু পংক্তিকে অমর করিয়া রাখিয়াছে —

(১) 'কপোত মিথুন সম যাব উড়ি নীড়ে।'

(২) 'ছিনু মোরা সুলোচনে, গোদাবরী তীরে
কপোত কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষ চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে।'

মধুসূদনের কাব্যে প্রাচীন সাহিত্যের ন্যায় প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানে মানবত্ব আরোপকে অবলম্বন করিয়াই অনুভূতিশীল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যে সার্থকতা দেখাইয়াছেন তাহাতে রূপান্তরের গৌরব তাহার প্রাপ্য কিন্তু কল্পনার মৌলিকত্বে নয়। ব্রজাঙ্গনা কাব্যের প্রকৃতির সহিত সীতার সখী সম্পর্ক বহু অংশে বাহ্যিক। উপবন দুহিতা শকুন্তলার মত সীতা অরণ্যের সহিত আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন নাই।

---

(১) মধুসূদন রচনাবলী। বীরাঙ্গনা কাব্য। ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত। অষ্টমসর্গ। পৃথম সংস্করণ। পৃঃ ১৫৫।

(২) মধুসূদন রচনাবলী। মেঘনাদবধ কাব্য। ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত। প্রথম সংস্করণ। পৃঃ ৬৫

হেমচন্দ্র প্রকৃতি বর্ণনায় উপমার প্রয়োগে তিনি হোমারের রীতি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পূর্বের কবিগণ উপমাগুলি সাধারণতঃ কালিদাসের রীতি অনুসরণ করিতেন। কালিদাসের সহিত হোমারিক রীতির পার্থক্য রহিয়াছে। হোমারিক উপমাগুলি দীর্ঘ একটি চিত্রকে বিশদ উপমার দ্বারা ফুটাইয়া তোলে। ইহা হইল হোমারিক উপমাগুলির বিশেষত্ব।। আর কালিদাসের উপমারীতি ভাষার দিক দিয়া সংক্ষিপ্ত এবং তাহাদের অর্থের মধ্যে আছে গভীর ব্যঞ্জনা ও স্থিতিস্থাপকতা। হেমচন্দ্রের অনুভূতিশীল অথবা নির্বিকার প্রকৃতিচিত্রগুলি গতানুগতিক অবশ্য কোথাও কোথাও দৃশ্যবর্ণনায় কবি প্রকৃতি বর্ণনার চিরাচরিত রীতির উপর বর্ণ প্রলেপ দিয়া তাহাকে বর্ণ বহুল করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু রহস্যময়তা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। যেমন 'বৃত্র সংহার' কাব্যে সূর্যের বর্ণনা। বিভূতিভূষণ যেমন প্রকৃতির মাঝে স্রষ্টাকে ধ্যান নিবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার সৃষ্টিকে লোকোত্তর মহিমাময় করিয়া তুলিয়াছেন। ঈশ্বর গুপ্ত বা হেমচন্দ্র প্রকৃতির মাঝে স্রষ্টার কথা স্মরণ করিলেও, এই স্মরণের পশ্চাতে বিভূতিভূষণের মত অনুভূতিলব্ধ সত্য নাই – স্রষ্টাকে স্মরণ করিতে হইবে বলিয়াই কবি চিরাচরিত প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন কিন্তু গভীর অনুভূতির সীমায় পৌঁছাইতে পারে নাই। হেমচন্দ্র কোথাও কোথাও প্রাকৃতিক দৃশ্য হইতে নীতি সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকৃতির চিন্ময় বাংলাকাব্যে ইহা এক নতুন ইঙ্গিত বহন করিয়া আনে। হেমচন্দ্র, গীতি কবিতার রচয়িতা হিসাবে প্রকৃতি প্রেমের নতুন একটি ধারার আভাষ তাঁহার কাব্যে প্রবর্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন – যদিও তাহা আভাষমাত্রই ছিল, তাহা ফুলে ফলে পত্রে পুষ্পে বিকশিত হইতে পারে নাই। ঈশ্বর গুপ্ত চোখ মেলিয়া প্রকৃতিকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন আর হেমচন্দ্র ইংরেজী রোমান্টিক কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলীর কাব্যের সহিত

পরিচিত হওয়ার ফলে প্রকৃতিচিত্রগুলি আপন মনের ভাব সমন্বিত করিবার অস্ফুট প্রয়াস প্রথম প্রয়াসলেন। বাংলাকাব্যে ইহাই নতুন সুরের সংযোজন-মানব মনের সহিত নিবিড় অন্তরঙ্গতার ইঙ্গিত।

(১)'মন্দ মন্দ বায়ুরে প্রকৃতিসনে মানবের মন
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি,
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদে এমন,
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী।'

ইহা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে নতুন সুর। প্রকৃতি প্রেমের এই ধারা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পন্থী। তাই তাঁহার কাব্যে মানবজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির প্রপঞ্চ বা দৃশ্যের সাদৃশ্য বা পার্থক্যই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য কবির প্রকৃতি সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা এবং প্রকৃতির প্রতি নিবিড় ও অন্তরঙ্গ হইবার ইঙ্গিত তিনি বুঝিলেও সমগ্রভাবে তিনি স্থূলভাবেই বুঝিয়াছিলেন। এই কারনেই তিনি প্রকৃতির সহিত অন্তরঙ্গতা করিতে গিয়া অন্তরের অন্তর তাহার সহিত মিলন ঘটাইতে পারেন নাই। বাহির হইতে নিজস্ব ভাবগুলিকে প্রকৃতিচিত্রের সহিত জুড়িয়া দিয়াছেন মাত্র। তিনি এই সত্যকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে না পারায় প্রকৃতির সহিত আপনার মনের ভাব সমন্বয় করিতে গিয়া বহু জায়গায় ব্যর্থতা লইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন।

(২)'সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উথলি,
পদ্ম, জল, তলাশয় ভুলিয়া সকলি।
অদৃষ্টের নিবন্ধন ভাবিয়া ব্যাকুল মন
সেই মৃণালের মত হায় কি সকলি।'

---

(১) হেমচন্দ্রের কাব্য গ্রন্থ। হেমচন্দ্র রচনাবলী। সম্পাদিত, সজনীকান্ত দাস। প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃ ৫৬

(২) ''পদ্মের মৃণাল'' হেমচন্দ্রের রচনাবলী। সম্পাদিত, সজনীকান্ত দাস, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃ ৩১

এই পঙক্তি হইতে ইহা প্রকৃষ্টরূপে বুঝা যায় কবি এখানে প্রকৃতিকে নিজের অন্তর দিয়া দেখেন নাই। এমন নিজের মনের ভাবগুলিকে প্রকৃতির নিজের দৃশ্যের মধ্য হইতে উদাহরণরূপে কিছু খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। অপনার অন্তর্লোকের অভিসার এখানে সফল হয় নাই, বাহিরের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে বর্ণনামাত্র করিয়া ভাবানুযায়ী প্রকৃতি চিত্রই এখানে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

হেমচন্দ্রের প্রকৃতিদৃষ্টিতে মরমতা ছিলনা, মূলতঃ গতানুগতিক পথকেই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভায় যে ধ্রুপদীধর্ম ছিল হয়তো উপমা, অলঙ্কার ও প্রকৃতিচিত্রনে সেই ক্লাসিসিজম ধর্মের কারনেই এই ধরনের প্রত্যয় ঘটিয়াছে। এই ব্যর্থতাকে স্বীকার করিয়া লইয়াও ইহা বলিতে হইবে হেমচন্দ্রের কাব্য বাংলা সাহিত্যে নতুন করিয়া প্রকৃতি পাঠ লইবার একটি নতুন সোপান। যাহার উপরেই পা দিয়া নবীনচন্দ্র বিহারীলাল অজস্রোচ্ছ্বাস পরিণতি লাভ করে এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণে তাহা বিরাট আকার ধারণ করে। ব্যক্তি প্রেমের মুক্তছন্দ প্রকাশ এবং নিখিল প্রেমের বিষয়বস্তু হেমচন্দ্রে পরিস্ফুট হইয়াছিল। নীতিমূলক কবিতায় জনপ্রিয় হেমচন্দ্র কাহিনীর নায়িকার মুখ দিয়ে উক্তি করাইতে দ্বিধাবোধ করে নাই।

(১) 'যাতে সূত্রে রেখে কভু প্রেমে বাঁধা যায়,
বন্ধন দেখিলে প্রেম তখনই পালায়।
স্বাধীন মকর কেতু স্বাধীন প্রণয়,
না বুঝে অবোধলোক চাহে পরিণয়।'

---

(১) হেমচন্দ্রের গ্রন্থ কবিতাবলী। 'সাহিত্য বিচিত্রা'। ডঃ রথীন রায়। নবম সংস্করণ, পৃঃ ৩৭

ড্রাইডেন, লংফেলো, পোপ, টেনিসন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিগণ এই যুগের কবিদের মধ্যে ভালভাবেই প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু লংফেলোর 'সাম অব লাইফ' কবিতার অনুবাদ করিয়া হেমচন্দ্র যেরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, চট্টাম্বুরের কবি হেমচন্দ্র 'স্কাইলার্ক'এর কবিতা অনুবাদ করিতে যাইয়া কবিধর্মের সীমা ও স্বরূপ তিনি অসহায়ভাবে তাঁহার সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন।

(১) 'শেলীর লিরিসিজমের সূক্ষ্মতা,

কবি কল্পনার মৌলিকতা ও আকাশ পিপাসার দিব্য আকুতি হেমচন্দ্রের কবিতায় দেখা দেয় নাই।'

কবিতায় প্রকৃতির সহিত মানবমনের যে অদৃশ্য সম্বন্ধ আছে তাহা কবির কাছে চকিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার অন্যান্য কবিতায় কবি 'ওড' জাতীয় কবিতার টেকনিক্ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি প্রকৃতির বৈচিত্র্যে আত্মলীন সৌন্দর্যকে অস্বীকার করেন নাই।

(২) 'সত্য কিরে তোরি দেহে এত শোভা বাস?
কিংবা সে আমারই মন
প্রমোদে হয় মগন,
ভাবে আপনার প্রভা তোতে পরকাশ —
চেতন ভাবিয়া তোরে শোনে নিজ ভাষ
ওরে জড়দেহ পদ্ম।

---

(১) 'সাহিত্যবিচিত্রা'। ডঃ রথীন রায়। নবম সংস্করণ। পৃঃ ৩৭

(২) ''পদ্মফুল''। হেমচন্দ্ররচনাবলী। সম্পাদিত, রজনীকান্ত দাস, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ২১৫

হেমচন্দ্রের আত্মলীন সৌন্দর্যবোধের ঈষৎ আভাস পাশ্চাত্য প্রকৃতিচিত্র চিত্রনের দ্বারা প্রভাবান্বিত কবিতায় নিসর্গ চিত্রের অপরিপুষ্ট বর্ণনার প্রচেষ্টা এবং কাব্য নিরিকের নির্ভরযোগ্য আমদানী বিহারীলালে অনেক দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত করে। প্রকৃতি বর্ণনায় নবীনচন্দ্রের কাব্যে বেশ কিছু বৈচিত্র্য পাওয়া যায়। অথার কাব্য দোষেগুণে যে বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য দান করিয়াছে তাহাতে ইশ্বরগুপ্তের মত প্রকৃতিতে চোখ মেলিয়া চাওয়ার চেষ্টা একটা বিশিষ্ট মেজাজ লইয়া প্রকৃতির মধ্যে, নিসর্গ চিত্র সম্পর্কে বা বর্ণনায় আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া তাহাকে নতুনরূপে রূপ দান করিবার চেষ্টা এবং তাহার বিফলতা সবই নবীনচন্দ্রের কাব্যের বহু অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে।

তথা হইলেও নবীনচন্দ্র প্রকৃতি বর্ণনায় হেমচন্দ্র হইতে একধাপ আগাইয়া রহিয়াছে। যদিও নিসর্গ কবিতার ক্ষেত্রে নবীনচন্দ্রের উদ্দেশ্য উপায় প্রায় একই ধরনের। নবীনচন্দ্র র এই অগ্রগতির মূলে রহিয়াছে তাঁহার কবি দৃষ্টির অন্তর্লীন সরলতা। হেমচন্দ্রের আঙ্গিক ও বিষয়ের সহিত নবীনচন্দ্র অনেকটা সমধর্মী হইলেও নবীনচন্দ্রের নিসর্গ চেতনা হেমচন্দ্র হইতে কোথাও কোথাও উত্তীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, নবীনচন্দ্রের রসমধুর আত্মদৃষ্টির অন্বেষ ও অকৃত্রিম হৃদয়বোধের উন্মোচনে।

(১)'রজনীর ক্ষনে ক্ষনে দুঃখের বারতা
কহিয়াছি কত শত বলিব কেমনে,
যামিনী শুনিয়া দুঃখ, দেখি কাতরতা
কাঁদিয়াছে ঝিল্লিরবে শুনেছি শ্রবণে।
তাঁধার হৃদয়াকাশে তারার মতন,
ফুটিয়া শতেক আশা মিলেছে তখন।'

---

(১)''প্রত্যাখান'' নবীনচন্দ্র সেন। বাংলাকাব্যে প্রকৃতির রূপ। ভূমিষ্ঠ কুমার সেন, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ২১৩

(১)'দেখাও কেন উচ্চতরুবর
অরণ্য হইতে তুলি উচ্চতর শির,
করিতেছে আকাশের সীমা নিরূপণ।'

নবীনচন্দ্র অনেক স্থানেই প্রকৃতিকে রসবস্তু করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহার অপরূপ বর্ণনায়। প্রকৃতি জড়বস্তু থাকে নাই যদিও তিনি প্রকৃতির দিকে নিজের চোখ লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার কাব্যে চোখে দেখা প্রকৃতি চিত্রের পরস্পর বিচ্ছিন্ন খণ্ড অংশগুলিকে একটি অখণ্ডসুরের সমন্বয়ে আনিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার নিজস্ব সীমাবদ্ধ কাব্যিক রসসৃষ্টির দ্বারা। যদিও এই সমন্বয়ের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল রবীন্দ্রনাথ ও তাহার পরে বিভূতিভূষণে।

ইহার পরবর্তী কবি হিসাবে নিসর্গ প্রীতির ধারায় বিহারীলালের নাম উল্লেখ করিতে হয়। বিহারিলালের আবির্ভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্র নাথ বলিয়াছেন'সেই উষালোকে কেবল একটি প্রাতঃ স্বরের পাখি সুমিষ্টস্বর সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল।' বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের নানা প্রতিভার আলো বিচ্ছুরিত হইবার পূর্বে বিহারীলালে স্বরের কণ্ঠ বাজিয়া উঠিয়াছিল। তাই বিহারীলাল স্বরের পাখী। তিনি যে একটি যুগান্তরকারী পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন তাহা নয় কিন্তু কবিতা লেখার পথ হইতে একটি নতুন যুগের আরম্ভ তিনি বাংলার সাহিত্যিককে দিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিধুবাবু, শ্রীধরকথক, অকৃত্রিমসুরে গীতি কবিতার ধারায় দেশকে প্লাবিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কবিমনের সহিত পাঠকচিত্তের প্রত্যক্ষ অন্তরঙ্গতা তাহাতে স্থাপিত হয় নাই। কাব্যের মধ্যে কবির ব্যক্তিজীবনের স্পন্দন কবির ছোট ছোট আশা আকাঙ্খার গভীর অর্থানুভূতির পরিচয় বিহারীলালের কাব্যে সর্বপ্রথম স্পষ্ট আকারে লাভ করা যায়, ইহাই আধুনিক কবিতার মূল উপাদান। কবি মনের

---

(১)''অশোক বনে সীতা''। নবীনচন্দ্র সেন। বাংলা কাব্যে প্রকৃতির রূপ। অমিয়কুমার সেন, প্রথম মুদ্রণ, পৃ ২১৩

অফুরন্ত আকাংখার অভিব্যক্তি, কবির অনন্তবাসনা, কামনা, স্বপ্নপরিসরের মধ্যে রসানুভূতি দিয়ে মানুষের এই হৃদয়ভাবকে প্রকাশ করাই গীতিকবিতার ধর্ম। বিহারীলালের মধ্যে যেন সহস্র বছর পর ভারত আবার তাঁহার প্রকৃতি প্রিয়তা প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে পশুপাখী ইত্যাদির মধ্যে বাস করিবার যে বৈচিত্র্যময়, আনন্দ অনুভূতিকে স্পন্দিত করিয়া তুলিয়া তাহা যেন আবার ফিরিয়া আসিল।

(১) 'কভু ভাবি কোন ঝরণার
উপলে বন্ধুর যার ধার
প্রচণ্ড প্রপাত ধ্বনি
বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি
চতুর্দিকে হতেছে বিস্তার।'

আবার বর্ষার ঘোর নিশিথে মেঘে মেঘে আকাশ যখন অন্ধকার হইয়া আসিবে — বিদ্যুৎ ঝলসিত আকাশ গর্জন করিবে, সে গভীর রাত্রিতে কবি নির্জন কুটির বাসের আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র প্রকৃতির বর্ণনায় আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পূর্বেই দিয়াছেন — বিহারীলাল এই আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গীর স্ফুট পরিচয়কে নির্বাচন রুচির পরিচয় দিয়া স্পষ্ট আকার ধারণ করাইয়াছেন।

(২) বিমল নীল নিথর শূন্য,
শূন্য, শূন্য-শূন্য-অগম শূন্য,
দূর অতিদূর দুপাখা ছাড়িয়ে
শকুন ভাসিয়ে যায়।'

আবার হেমচন্দ্র প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের গভীর অন্তরঙ্গতার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন,

---

(১) বঙ্গসুন্দরী। বাংলা সাহিত্যের নবযুগ। শশীভূষণ দাসগুপ্ত। সপ্তম মুদ্রণ। পৃঃ ২১৫

(২) শরৎকাল। বাংলা কাব্যে প্রকৃতির রূপ। অমিয় কুমার সেন। প্রথম সংস্করণ। পৃঃ ২২১

বিহারীলাল সেই অন্তরঙ্গতারও ইঙ্গিত দিয়াছেন –

(১) 'প্রণয় করেছি আমি
প্রকৃতি রমণী সনে
যাহার লাবণ্যচ্ছটা
মোহিত করেছে মনে।'

তিনি এইখানেই প্রকৃতিপ্রেমিকরূপে আত্মাইয়া তুলিয়া তাহার সৌন্দর্যটুকু উপলোগ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপ পুরাতন উপাদান লইয়া করিবার হইলেও বিহারীলাল গভীর অন্তরঙ্গতা ও ভাবাতিশয্যের দ্বারা সেগুলিকে সজীবরূপ দান করিয়াছেন। কীটসের ন্যায় বিহারীলালের নিকট প্রকৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবেদন লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রকৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসা কীটসের মতই ইন্দ্রিয়ানুগ। ভারতবর্ষের সনাতন শাশ্বত প্রকৃতির রূপের আত্মলীন বর্ণনায় যে নিষ্টিকতা ছিল, বিহারীলালের রোমান্টিকতা তাহাকে নতুন খাতে এক প্রণবন্ত স্রোত স্বিনীর রূপ দিল। তিনি প্রকৃতির প্রতি এই বৈচিত্র্যময় রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীতে উন্মুখ ছিলেন। কবি প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটি রহস্যানুভূতির সন্ধান পাইয়াছেন।

বিহারীলালের এই সুতীব্র রোমান্টিক আকাঙ্খা ও কল্পনার নেপথ্যে সর্বপ্রথম বাংলা কবিতায় গভীরভাবে শেলী, কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি ইংরেজ কবির নিষ্ক্রিত উপস্থিতির সাক্ষ্য বহন করে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে প্রকৃতির সজীবসত্তার বিশদও সম্যক পরিচয় থাকিলেও প্রকৃতি সম্পর্কে এই ধরনের বিরহমিলনের প্রেমানুভূতি তাহাকে জীবনের এমন অকুণ্ঠ স্ফূর্তি ছিলনা। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে নিসর্গ চিত্র আপন সত্তাকে অনুভব করিবার যে বাসনা ছিল যাহা মধ্যযুগের সাহিত্যে অন্তঃস্রোবী ফল্গু হইয়া কালের গর্ভে অন্তর্লীন হইয়াছিল তাহা বিহারীলালের প্রকৃতির মধ্যে নিজের আত্মিক স্বরূপ সন্ধানের দুর্বার প্রবণতায়

(১) সারদামঙ্গল বাংলা সাহিত্যের নবযুগ। শশীভূষণ দাসগুপ্ত। সপ্তম সংস্করণ। পৃঃ ২১৬

এক বিস্ময়ের ঘটাইয়া সেই গুপ্তলীন ফল্গুস্রোত বাহির হইয়া আসিল। যদিও তাহার সাহিত্যে শব্দচয়নে, ভাবের শৈথিল্যে, প্রকরণভঙ্গীতে অনেক অপূর্ণতা ছিল। তাহা সত্ত্বেও বাংলা কাব্যে তথা সাহিত্যে নিসর্গ চেতনার যথার্থ আধুনিকরূপের আধুনিক শিল্পী হইলেন বিহারীলাল। বিহারীলালকে প্রকৃতই ভোরের পাখী বলা যায়। যদিও বিহারীলাল আধুনিক নিসর্গ চেতনার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত রূপ পরিণতি আনিয়া দেননাই, তাহা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন পুরাতন ভারতের নিসর্গ চেতনার সহিত আধুনিক বাংলার নিসর্গ চেতনার আধ্যাত্মিক স্বরূপ সন্ধানের যোগসূত্রস্থাপনকারী সেতু। তাহার পরবর্তী যে কবি নিসর্গ চিন্তায় বাংলা সাহিত্যে কিছু স্বাতন্ত্র্য রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহারা হইলেন দেবেন্দ্রনাথ বা অক্ষয়কুমার। 'অনেক গুচ্ছ', 'গোলাপগুচ্ছ' বিভিন্ন কবিতায় দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রকৃতি সম্পর্কে ইন্দ্রিয় সচেতন উজ্জ্বল বর্ণের রূপ বিলাস সহজেই পাঠকের চিত্তে মোহ সৃষ্টি করে। নিসর্গধ্যানে বর্ণবিরল, বিরহম্লান নিঃসঙ্গতার সুর মাঝে মাঝে ব্যঞ্জিত হইয়াছে অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতায় নিসর্গচেতনার কোন সুস্পষ্ট অবয়ব ইহাদের কাব্যে ফুটিয়া উঠে নাই। তাঁহারা বাংলা সাহিত্যের নিসর্গ নির্ভর সাহিত্য কৃষ্টিতের জন্য কোন বিশিষ্ট নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নন। তবুও উত্তর বিহারীলাল এবং প্রাকরবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে নিসর্গ রচনার প্রেক্ষাপট বুঝিয়া লইবার জন্য ইহাদের উল্লেখ প্রয়োজন।

বিহারীলাল যে চলার পথ ধরিয়াছিলেন নিসর্গ চেতনার ক্ষেত্রে, সেই পথই অনেক বাঁকঘুরিয়া শেষ পর্যন্ত নিসর্গ চেতনার সমুচ্চশিখড় দেশে পৌঁছাইয়াছে। সেই শিখরদেশ হইলেন রবীন্দ্রনাথ।

প্রকৃতি চেতনা সম্পর্কে রবীন্দ্র নাথের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা আঁকিতে যাওয়ার প্রয়াস ধৃষ্টতামাত্র। তবুও তাহার ভূমিকা যে অসীম তাৎপর্যপূর্ণ এই কথা অস্বীকার করিবার মত সাহস ও স্পর্ধা কাহারও নাই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক শিল্পভাবনা জড়াইয়া রহিয়াছে তাঁহার জীবনবোধের সমগ্রতার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থিতে। প্রকৃতি এই সমগ্রতায় এক মহান তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। সনাতন

ভারত যেন বহু সহস্র বৎসর পরে আর এক ঋষির দৃষ্টিতে আর এক ভঙ্গিতে আর এক শ্রেণীনী ভাবধারায় পুষ্ট হইয়া আর এক ধারার রচনাশৈলির মধ্যে আরও মহৎ সমুন্নত প্রগাঢ় দুর্লভ আত্মিক স্বরূপ সন্ধানের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে আত্মলীন হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তার তিনটি প্রবাহ একটি অখণ্ডসূত্রে বাঁধা পড়িয়াছে।

(১) মানবিকপ্রেম চেতনা, (২) ভগবৎ চেতনা, (৩) প্রকৃতি চেতনা। এই তিনটি চেতনার মধ্যে প্রকৃতি চেতনা, প্রকৃতির নিজস্বরূপ ও লীলারস মাধুর্যের মধ্যেই তাঁহার সকল ভাবধারার সঙ্গম ঘটিয়াছে। মুক্ত প্রকৃতির উদার আলো আকাশের জন্য অতৃপ্ত পিপাসা তাহার শৈশবের নগরকারায় রুদ্ধ কবিচিত্ত দারুন ব্যাকুল মন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার বাল্যকালে 'অবোধবন্ধু' পত্রিকার মাধ্যমেই তাহার প্রথম পরিচয় বিহারীলালের নিগূঢ় নিসর্গ উপলব্ধির সঙ্গে —'তাহার সেইসব কবিত্ব সরল বাঁশীর সুরে মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত।' রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে বিহারীলালের প্রকৃতি কবিত্ব তাহার উপর কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন —

(১)'যদিদং কিঞ্চিত জগৎ সর্বংপ্রাণ একটি নিঃশ্বসিত।' রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তায় ভারতীয় সংস্কৃতি বাহিত নিসর্গবোধ গভীর রেখায় উৎকীর্ণ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্তে প্রকৃতি চেতনাকে উপনিষদের বাণীস্বরূপ বিশ্বব্যাপ্ত এক সুমহান যাত্রা যোজনা করিয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের গভীর প্রকৃতিপ্রেম ক্লাসিকদের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার হইতে অর্বাচীন সংস্কৃত কাব্য তথা বাংলা কাব্য বঞ্চিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ভারতীয় জীবন হইতে হারাইয়া যায় নাই। বিহারীলাল রত্ন খুঁজিতে গিয়া জীবনের গভীরে যে কল্পপ্রেতের প্রবাহ পাইয়াছিলেন, উহা তিনি দেখিয়াছেন চির স্থির করিয়া রহিতে — রবীন্দ্রনাথে তাহা বিরাট কলপ্রবাহিনীর রূপ লইয়া

---

(১) কঠোপনিষদ। ২।৩।২

ভারতীয় সাহিত্যের সেই বিরাট কলধ্বনী দুকূল প্লাবিত করিয়া মহামানবের সৌন্দর্যের পিপাসা বিরাট ভারত ঐতিহ্যের পরম সার্থকতায় প্রকৃতির জন্য তৃষ্ণার বারিদানে পরম সার্থকতায় এক আশ্চর্য পরম রস লাভ করিয়াছে। একদিকে যেমন তিনি ভারতীয় ঋষি ও উপনিষদের প্রভাবে প্রকৃতির নিত্য স্বরূপ ও লীলা মাধুর্য দেখিয়াছিলেন এবং বহুতর বৈচিত্র্যের মধ্যে এক অখণ্ড পরম সত্তার অনুভব করিয়াছিলেন – অন্যদিকে ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের মধ্যে শেলী, কীটস্, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর প্রকৃতি দৃষ্টি'রবীন্দ্রনাথ আপনার আশ্চর্য সাহিত্য প্রতিভারগুণে আত্মস্থ করিয়া লইয়াছিলেন। রোমান্টিক যুগের কবিদের সম্পর্কে লিখিতে গিয়া একজন সমালোচক বলিয়াছেন —

(১) 'They all had a deep interest in nature, not as a Centre of beautiful scenes, but as an informing and spiritual influence of life. It was as if, frightened by the coming of industrialism and the nightmare towns of industry, they were turning to nature for protection or as if, with the declining strength of traditional religious belief, men were making a religion from the spirituality of their experiences'.

(২) রোমান্টিক বিষয়ক কবিতার বৈশিষ্ট্য মূলতঃ তিনটি—

(১) তাঁহারা প্রকৃতির বহিরাভ্রয়ীরূপের চেয়ে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত গূঢ় শক্তির সঙ্গে এক প্রকার আত্মিকযোগ অনুভব করিয়াছেন।(২) যন্ত্রসভ্যতার যুগে তাঁহারা মুক্ত প্রকৃতির বুকে আশ্রয় খুঁজিয়াছেন।(৩) প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা নতুন একধরনের প্রকৃতিতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন।'

---

(১) সাহিত্য বিচিত্রা : ডঃ রথীন রায়। পৃঃ ২৯৩ প্রথম সংস্করণ।

(২) সাহিত্য বিচিত্রা : ডঃ রথীন রায়। পৃঃ ২৯৩ প্রথম সংস্করণ।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার একটি কবিতায় প্রকৃতিদর্শনের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন —

(১) 'The sounding contract
Hunted me like a passion, the tall rock
The mountain, and the deep gloomy wood,
Their colours and their forms were to me,
An appetite - a feeling and a love
That had no need of a remoter charm
By thought supplied, nor any interest,
Unborrowed from the eye.'

ইহা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতি চিত্রণের বা নিসর্গ চিত্রনে প্রথম দিকের কবি। কবির নিকট প্রকৃতি তাই 'colour' ও 'form' এর জগৎ হইয়া উঠিয়াছে।(২)'প্রকৃতি চেতনার প্রথম স্তরে কবি রূপ ও বর্ণের অনুপম্য অস্বীকার করিতে পারেন নাই। পরবর্তীকালে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বর্ণগন্ধের অন্তরালে এক মহাসত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন - সে এক অতিশুভ্র জ্যোতির্ময় চৈতন্যশক্তি। ক্রমশই তিনি প্রকৃতির মধ্যে এক জাতীয় ঐশীশক্তি অনুভব করিয়াছিলেন। তাবার বর্ণগন্ধের কারাগারে আবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই। ' তাবার প্রকৃতির রূপের মধ্যে অপার্থিব দেবলোকের সুপ্ত কীটস্‌-এর সৌন্দর্যলোক উদ্ঘাটিত করিয়াছে। (৩) ''কীটস্‌ তাঁহার সংকীর্ণ দেশকালের সীমায় বসিয়া কত বিস্মৃতপ্রায় মৃতযুগের কাহিনী না শুনিয়াছিলেন, তাই তিনি শুনাইয়াছিলেন আমাদের তাঁহার পৃথিবী সম্পর্কে - সুরলোক বিহারের পৃথিবী - এই যে 'The poetry of earth is never deed'

(১) ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ : Tintern Abey. সাহিত্য বিচিত্রা, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ২১৫
(২) সাহিত্য বিচিত্রা : ডঃ রথীন রায়। পৃঃ ২১৫। প্রথম সংস্করণ।
(৩) সাহিত্য বিচিত্রা : ডঃ রথীন রায়। পৃঃ ২১৬, প্রথম সংস্করণ।

রূপাতীত অতীন্দ্রিয় ভাবুকতা তাহাকে নিছক বহিরাশ্রয়ী প্রকৃতির 'ফটোগ্রাফার' করিয়া তুলেননি, প্রকৃতির মর্মমূলে এক অব্যক্ত ভাষণ উদ্ঘাটন করিয়াছেন মাত্র।'' আবার ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থীয় দৃষ্টি বর্ণ গন্ধরূপ ও বিহ্বল জগৎ ছাড়াইয়া এক অদৃশ্য জগতের সন্ধানী।

'When the light of sense
Goes out but with a flash that has revealed
The unvisible".

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির বিচিত্র উপকরণের মধ্যে ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের মতই নদী, মেঘ, ঝড় কিংবা অবারিত আকাশের মধ্যে আপন গতির তীব্র ব্যাকুলতার প্রতিফলন দেখিয়াছেন। এই প্রতিফলন দেখি বস্তুকে অতিক্রম করিয়া ভাবের মাধ্যমে নিসর্গ বর্ণনার প্রয়াস, আবার ইহাও দেখিতে পাই প্রকৃতিকে ইন্দ্রিয় নির্ভর স্থির চিত্ররূপে অঙ্কনের প্রবণতা অথবা অনুভব করি মঙ্গলদায়িনী শান্ত রসাস্পদ আধ্যাত্মশক্তি রূপে প্রকৃতিকে উপলব্ধির তন্বিষ্ট সাধনা। এইসব দেখিয়া স্বভাবতই মনে পড়ে পূর্বোক্ত বিদেশী কবিদের সহিত রবীন্দ্র নাথের নিবিড় ভাবযোগসূত্রের কথা। এইসব কিছু কাব্য দিয়াই রবীন্দ্রনাথের নিসর্গচেতনা গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র কয়েকটি কাব্যধারার প্রভাবে অভিঘাত সৃষ্ট কবি নন। তাহার কবিসত্তা চেতনার মৌলিকতায়, ব্যাপকতায়, বৈচিত্র্যে গভীরতায় প্রায় ধারণাতীত রূপে স্বকীয়তার উদ্ভাসনে সমুজ্জ্বল। (১)'উপনিষদে যে বিশ্বব্যাপী প্রাণ আছে, যে প্রাণ বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবসত্তার মধ্যে এক নিত্যকালীন অচ্ছেদ্য যোগসূত্র রচনা করিয়াছে যাহা উপনিষদের মর্মবাণী রবীন্দ্রনাথ তাহার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া — সেই উপলব্ধিতেই তরঙ্গিত

---

(১) সাহিত্য ও সংস্কৃতি : শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা। ১৩৮২

হইয়া উঠিয়া তিনি উপলব্ধি করিলেন — তিনি এক বিশ্বিষ্ট মানবসত্তা নন — তিনি সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি তথা বিশ্বজীবনের অঙ্গীভূত। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিলেন দূর অতীতের সৃষ্টির আদিলগ্নে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া ছিলেন, সমগ্র বিশ্বের মৃত্তিকায় পরিব্যাপ্ত আছার সেই আদিম প্রাণের চেতনার সহিত মিশিয়াছে এক গূঢ় চেতনা। আদিম প্রকৃতির মধ্যে আপনার সমস্ত সত্তার উপলব্ধি। এমন আত্মবিলুপ্ত নিসর্গ প্রেমচেতনা আর কোন কবির মধ্যে পরিস্ফুটভাবে জাগে নাই।'' এই চেতনার পরিচয় সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট হইয়া উঠে [illegible] ছিন্নপত্র পর্বে, কবিতার মধ্যে সোনারতরী, চৈতালী এবং উৎসর্গ প্রভৃতিগ্রন্থে। ইহার মধ্যে 'বসুন্ধরা' কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ Leafy luxury ও dreamy numbness ভরা প্রবল রূপপিপাসায় বিস্মৃত'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল' কিংবা প্রাতঃসন্ধ্যা ও চৈতালীতে অভিব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই নয়, সারাজীবনভর তিনি জীববাদী নিসর্গ দৃষ্টির সঙ্গে ইন্দ্রিয়ঘন গাঢ় তৃষ্ণাকে যুক্ত করিয়াছেন। আবার কবি একসময়ে প্রকৃতির রসের ও রূপের ইন্দ্রজালে আবিষ্ট হইয়া পথ চলিতে চলিতে রোমান্টিকতার দৃষ্টি এক বিশ্বময় দেবতার মিষ্টিক উপলব্ধিতে অতৃপ্ত হইয়াছে। প্রকৃতিপ্রেম উত্তীর্ণ হইল দিব্যপ্রেমে, নৈবেদ্য, গীতিমাল্য গীতালি পর্বে। এই মিষ্টিক প্রবাহ কবির শেষ জীবন পর্যন্ত চলিয়াছিল, এমনকি মৃত্যুর ধূসর আলোয় কবি প্রকৃতির আপন সত্তার মধ্যে এক পরমবিস্ময়কর অদৃশ্য ও অনির্বচনীয় যোগসূত্র দেখিতে পাইয়াছেন। (১)'প্রবাহমান কালচেতনা হইতে প্রকৃতি'স্বয়ম্'-এর চেতনার দিকে তরুণ কবি চিত্তকে বেশী আকৃষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু জীবনে যখন গোধূলির রঙ লাগিয়াছে তখন মৃত্যুসচেতন কবির দৃষ্টিতে সমগ্রপ্রকৃতি বিশ্বের মধ্যেই যেন কালস্রোত অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে।'

(১) সাহিত্য ও সংস্কৃতি : শ্রাবন-আশ্বিন। পৃ ২২৮

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিতেও নিসর্গ প্রকাশের দিক হইতে অনন্যতা লাভ করিলেও নাট্য সৃষ্টির মধ্য দিয়া তাহা নিসর্গ চেতনার নতুন কোন দিক উন্মোচিত হয় নাই। তাঁহার ছোটগল্পগুলিতেও ছুটি, শুভ, সমাপ্তি, অতিথির মধ্যে কবিতা গান বা নাটকের মত বেশী ব্যাপক ও বিচিত্রভাবে তাঁহার মনন অন্বিষ্ট হয় নাই। নিসর্গ চেতনাকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতি পুরান নির্মাণের প্রবনতা 'বসন্ত', 'নটরাজ', 'শেষবর্ষণ' খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এইখানে প্রকৃতি পুরানের সৃষ্টি করিয়া নিসর্গ চেতনার এক বিশ্লেষণের নিসর্গ-চেতনার অভিনবত্বে মাত্রা সংযোজন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ শুধু কাব্যে নয় ব্যবহারিক জীবনেও প্রকৃতিকে আপন সহচর ও জীবনধর্মী করিয়া লইয়াছিলেন তাহার শিক্ষাদর্শের অন্যতম উপকরণ হিসাবে। প্রকৃতিকে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়া শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের শিক্ষার জন্য – ছাত্রদিগকে প্রকৃতির সহিত অচ্ছেদ্য যোগসাধনের প্রয়াসে ঋতু উৎসবের আয়োজন করেন এবং তাহার জন্য 'শারদোৎসব', 'ফল্গুনী' নাটক রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি প্রেম এইখানেই এক নতুন তাৎপর্য লাভ হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপনিষদীয় ভারতীয় দৃষ্টি দৃষ্টিভঙ্গী। অথবা বিশ্বব্যাপী প্রাণচেতনার, আদিম প্রাণের জৈবচেতনার সহিত আপনার সমস্তসত্তার পরিব্যাপ্তি ও আত্মবিলুপ্ত নৈসর্গিক প্রেমচেতনার উপলব্ধি কিংবা প্রকৃতিকে অপরিচয় রহস্যে আবৃত রাখিয়া তাহার মধ্যে গূঢ় তাৎপর্য সন্ধানে রোমান্টিক কবিতার যে বৈশিষ্ট্য অথবা প্রকৃতির অন্তর্নিহিত গূঢ়শক্তির সঙ্গে এক ধরনের আত্মিক যোগের অনুভব কিংবা ক্ষুদ্রসত্তার জটিল আবর্ত হইতে মুক্ত আত্মার অতিরিক্ত মুক্ত প্রকৃতির দিকে বিচরণের অবাধ স্পৃহা অথবা প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া প্রকৃতিতন্ত্রকে অতিক্রমের মধ্য দিয়া প্রকৃতির

নিত্যস্বরূপ ও লীলারসের মাধুর্যের মধ্যে নিজেকে অবগাহন করাইবার যে স্পৃহা রবীন্দ্রনাথের ছিল বিভূতিভূষণে তাহার সংক্রমন ঘটাইয়া বাংলা গদ্য সাহিত্যে এক সার্থক উত্তরাধিকার রূপে প্রকৃতিপ্রেমিক কবি হিসাবে তাহাকে খুঁজিয়া পাইল। চেতনার মৌলিকতায়, বৈচিত্র্যের গভীরতায়, বিরাট প্রতিভায় বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথের অনুকৃতি ছিলেন না কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে শিখরে বাংলা সাহিত্যকে তুলিয়া লইয়াছিলেন, বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথের সেই সুকৃতির আশীর্বাদপুষ্ট হইয়া রবীন্দ্রনাথের মতই এক প্রগাঢ় মিষ্টিক অনুভূতি লইয়া রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আত্মবিলুপ্ত নৈসর্গ প্রেমচেতনায় উপনিষদের বিশ্বব্যাপী প্রাণ চেতনায় বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবসত্তার মধ্যে অচ্ছেদ্য যোগসূত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'কাসমিক' চেতনার মতই বিভূতিভূষণও প্রকৃতির মধ্যে এক অসীমরহস্য জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল হইয়াছেন মিষ্টিক সাধকের মতই। বিভূতিভূষণও প্রকৃতির বাহিরের সৌন্দর্যের সংকীর্ণতায় আবদ্ধ থাকিতে পারে নাই - যেমন পারে নাই ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা রবীন্দ্রনাথ। বিভূতিভূষণ বুদ্ধির আলো নিভাইয়া একটি অতীন্দ্রিয় অনুভববেদ্য অসীম সৌন্দর্যলোকের ধ্যান করিয়াছেন। তিনি পরিচিত পৃথিবীর মধ্যে অপার্থিব রূপলোকের আস্বাদন অনুভব করিয়াছেন। আদিম ঋষিদের বিশ্বাসমত উপনিষদের চিন্তাপ্রসূত বিশ্বের মৃত্তিকায় পরিব্যাপ্ত আদিম প্রাণের চেতনার সহিত মিলিয়াছে এক গূঢ় বেদনা — সেই বেদনা হইল মানুষ আদিম প্রকৃতির সহিত অঙ্গাঙ্গী ছিল, আত্মজ ছিল, তাই তাহার তপোবন প্রাণবন্ত ছিল। প্রকৃতির তরুগুলি হাত বাড়াইয়া শকুন্তলাকে আশীর্বাদ

করিত, কিন্তু কবে কোনদিন সেই আদিম প্রকৃতি মানবসত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। প্রকৃতি হইতে মানবসত্তার এই বিচ্ছেদ বেদনাদূর করিতে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে পুনরায় খুঁজিয়া বাহির করিয়া নিলেন আপন অনিষ্ট ঋষির দৃষ্টি। বিশ্বদেবতার মিষ্টিক উপলব্ধির প্রত্যুষলগ্নে বিভূতিভূষণ প্রকৃতি চেতনার ইন্দ্রিয়ময় পাঠ রূপতৃষ্ণায় প্রকৃতি হইতে বিচ্ছেদের বিরহ বেদনায় বার বার দীর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি মুগ্ধ বিস্ময় ও সুপ্তবিষ্ট মৃদু ভাবুকতায় রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট প্রকৃতি চেতনার উচ্চশিখরে দাঁড়াইয়া এক কল্প পৃথিবীর মহাসাম্রাজ্যকারে পরিণত হইয়াছেন।